ইউনিট-১৪

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স

MORDERN PHYSICS & ELECTRONICS

ভূমিকা (Introduction)

বিজ্ঞানী উইলসন (C.T.R. Willson) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, আধান ক্ষরণ বন্ধ করার সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করে সত্ত্বেও আহিত স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ধীরে ধীরে তার আধানের পরিমাণ কমতে থাকে এবং

স্বর্ণ পাতদ্বয়ের ফাঁক কমতে থাকে। যন্ত্রের ভিতর বায়ুর পরিমাণ যত বেশী হয় আধান হ্রাসের হারও তত বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, স্বর্ণপাত সংলগ্ন বায়ুর তড়িৎ পরিবাহিতার জন্যই এরূপ ঘটে। অর্থাৎ বায়ুতে আয়নের উপস্থিতির জন্যই স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের স্বর্ণপাতদ্বয়ের ফাঁক ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। স্বাভাবিক চাপে বায়ু বা গ্যাস তড়িৎ পরিবাহী নয়, কিন্তু নিম্নচাপে এরা তড়িৎ পরিবাহী হয়ে যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স (Sir William Crooks) নিম্নচাপে গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করে ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কার করেন। এই ক্যাথোড রশ্মির মধ্যেই স্যার জে. জে. থমসন (Sir J.J. Thomson) ইলেকট্রনের সন্ধান পান। এ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হলো। এরপর থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৯০০ শতকের গোড়ার দিকে এক ঝাঁক প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের অবদানে অতি দ্রুত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে। আমরা এই ইউনিটে এক্সরে, তেজস্ক্রিয়তা, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করব।

পাঠ ১ ঃ এক্সরে (X-ray)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

১.এক্সরে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২.এক্সরের ধর্ম বর্ণনা করতে পারবেন।
৩.এক্সরের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

১৪.১.১ এক্সরে (X-ray)

বায়ুতে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। বায়ুশূন্য স্থানে তড়িৎ প্রবাহ হয় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা শুরু হলো। দুই মুখ বন্ধ 30 সেমি লম্বা এবং 4 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট একটি কাচ নলের দুই প্রান্তে দুটি তড়িৎদ্বার প্রবেশ করানো হলো। এই তড়িৎদ্বারের সাথে উচ্চ বিভবের তড়িৎ উৎস যুক্ত করা হলো। তড়িৎদ্বারের যে প্রান্তে ধনাত্মক বিভব যুক্ত করা হয় তাকে অ্যানোড এবং যে প্রান্তে ঋণাত্মক বিভব যুক্ত করা হয় তাকে ক্যাথোড বলে। কাঁচনলের মধ্যে একটি পার্শ্ব নল যুক্ত করা হলো। এই পার্শ্ব নলের সাহায্যে কাঁচনলের ভিতর থেকে বায়ু নিষ্কাশন করে ভিতরের বায়ুর চাপ কমানো হয়। এই নলকে ক্ষরণ নল বলে। ক্ষরণ নলের তড়িৎদ্বারে 1000V থেকে 1500V উচ্চবিভব প্রয়োগ করে ভিতরের বায়ুর চাপ কমাতে কমাতে 10^{-2} mmHg তে নামিয়ে আনলে ক্ষরণ নলের ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। নলে ক্যাথোড প্রান্তের বিপরীত দেয়ালে এক প্রকার সবুজাভ হলুদ রং-এর আলোর আভা বের হয়ে আসতে দেখা যায়। এই আভাকে প্রতিপ্রভা বলে। পরবর্তিতে জানা যায় 10^{-2} mmHg চাপে ক্যাথোড থেকে নির্গত এক প্রকার অতিক্ষুদ্র কণিকা নলের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খাওয়ার ফলে এই প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হয়। ক্যাথোড থেকে নির্গত হয় বলেই এই অতিক্ষুদ্র কণিকার স্রোতকে ক্যাথোড রশ্মি (Cathode ray) বলে। পরে প্রমাণিত হয় যে, ক্যাথোড রশ্মি "ইলেকট্রন"-এর (Electron) প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

জার্মানীর বিজ্ঞানী প্রফেসর উইলিয়াম রঞ্জন (Wilhelm Roentgen) ক্ষরণ নলে ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক ভাবে এক্সরে আবিষ্কার করেন। 10^{-3} mmHg চাপে

তিনি যখন ক্ষরণ নল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে নিকটে ফেলে রাখা একটি বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের প্রলেপযুক্ত পাতে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরো সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেন যে নলের যে অংশে ক্যাথোড রশ্মি আপতিত হয় সে অংশ থেকে সবুজাভ হলুদ রং-এর আলোর আভা ছাড়াও এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। এই অদৃশ্য রশ্মির প্রকৃত নাম না জানা থাকায় প্রফেসর রঞ্জন এর নামকরণ করেন এক্সরে (X-Rays)। একে রঞ্জন রশ্মিও বলে। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, অধিক গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলো কোনো ধাতুর প্রতিবন্ধকে বাধা পেলে গতিশক্তি হারায় এবং এই গতিশক্তি এক্সরেতে রূপান্তরিত হয়।

১৪.১.২ এক্সরে উৎপন্ন পদ্ধতি (Process of X-ray Production)

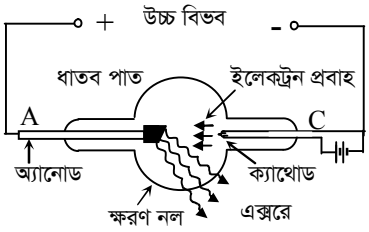

চিত্র ১৪.১

রঞ্জন রশ্মি উৎপাদন যন্ত্র একটি দুবাহু বিশিষ্ট ফাঁপা বায়ু শূন্য কাঁচ নল। এর এক প্রান্তে ক্যাথোড C টাংস্টেন তারের কুন্ডলী। ১৪.১ চিত্রানুসারে ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে একে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে প্রচুর তাপীয় ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। টাংস্টেন দিয়ে তৈরী অ্যানোড A এবং ক্যাথোড এর মধ্যে উচ্চ বিভব পার্থক্য রাখায় তাপীয় ইলেকট্রনগুলো ত্বরান্বিত হয়ে উচ্চ বেগে অ্যানোডরুপী টার্গেট A -কে আঘাত করে। ফলে কিছু ইলেকট্রনের গতিশক্তি এক্সরেতে রূপান্তরিত হয়।

এক্সরের একক হলো রন্টজেন। যে পরিমাণ বিকিরণের জন্য স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় এক মিলিলিটার বায়ুতে এক কুলম্ব আধান উৎপন্ন করতে পারে তাকে এক রন্টজেন বলে।

১৪.১.৩ এক্সরে এবং সাধারণ আলোর মধ্যে পার্থক্য(Difference between X-ray and Light)

এক্সরে এবং সাধারণ আলোর উভয়ই তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে।
নীচে এদের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেয়া হলো-

১। সাধারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $7\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ থেকে $4\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ -এর কাছাকাছি। অপরদিকে এক্সরে তরঙ্গদৈর্ঘ্য $10^{-8}\,\mathrm{m}$ থেকে $10^{-13}\,\mathrm{m}$ -এর কাছাকাছি।

২। সাধারণ আলো দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন রঙে বিভক্ত। অপরদিকে এক্সরে অদৃশ্য অর্থাৎ চোখে দেখা যায়না।

৩। সাধারণ আলো অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করতে পারেনা। এক্সরে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন। এক্স-রশ্মি অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারে। যেমন, মানুষের শরীর, কাঠ এমনকি লোহাকেও ভেদ করতে পারে।

৪। সাধারণ আলো গ্যাসীয় মাধ্যমকে আয়নিত করতে পারে না। অপরদিকে এক্সরে গ্যাসীয় মাধ্যমকে আয়নিত করে।

১৪.১.৪ এক্সরের প্রকারভেদ (Type of X-ray)

এক্সরে দুই প্রকার। যথা- কোমল এক্সরে (Soft X-ray) এবং কঠিন এক্সরে (Hard X-ray)।

১। কোমল এক্সরে ঃ এক্সরে যন্ত্রে তুলনামূলক কম বিভব প্রয়োগ করে যে এক্সরে পাওয়া যায় তাকে কোমল এক্সরে বলে। কোমল এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তুলনামূলক বড়, ফলে ভেদন ক্ষমতাও তুলনামূলক কম।

২। কঠিন এক্সরে ঃ এক্সরে যন্ত্রে তুলনামূলক বেশী বিভব প্রয়োগ করে যে এক্সরে পাওয়া যায় তাকে কঠিন এক্সরে বলে। কঠিন এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তুলনামূলক ছোট ফলে ভেদন ক্ষমতাও তুলনামূলক বেশী।

১৪.১.৫ এক্সরের ধর্ম (Properties of X-ray)

১। এক্সরে সরল পথে গমন করে।

২। এক্সরে অদৃশ্য রশ্মি। সাধারণ আলো রেটিনায় পড়লে দৃষ্টির অনুভূতি জাগায় কিন্তু এর ক্ষেত্রে এমন ঘটে না।

৩। এক্সরে তাড়িতচুম্বকীয় আড় তরঙ্গ।

৪। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট।

৫। এটি আলোর সমবেগে অর্থাৎ $3\times10^{8}\,\mathrm{ms}^{-1}$ বেগে গমন করে।

৬। আলোর ন্যায় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন এবং পোলারণ ঘটে।

৭। এই রশ্মি আলো তড়িৎ ক্রিয়া প্রদর্শণ করে।
৮। এক্সরে ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৯। এক্সরে তড়িৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না। সুতরাং এর কোন চার্জ নাই।
১০। এই রশ্মি গ্যাসের মধ্য দিয়ে গমনের সময় গ্যাসকে আয়নিত করে।
১১। এক্সরে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে।
১২। এক্সরের ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক।
১৩। এক্সরে জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করতে পারে।

১৪.১.৬ এক্সরের ব্যবহার (Uses of X-ray)

বর্তমান সভ্যতায় এক্সরের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। নীচে কিছু প্রচলিত ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. শিল্প ক্ষেত্রে ঃ শিল্প ক্ষেত্রে এক্সরের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। আসল ও নকল রত্নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, ঢালাই করা ধাতুর ভিতরের ত্রুটি নির্ণয়, আকরিকের মধ্যে অপদ্রব্যের উপস্থিতি নির্ণয়, ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার সন্ধান করা, ঝালাই-এর ত্রুটি নির্ণয়, মূল্যবান ধাতুর বিশুদ্ধতা নির্ণয় ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। টফি, লজেন্সে কোনো ক্ষতিকর বস্তু আছে কিনা তা সনাক্ত করার জন্য এবং টফি, লজেন্স, সিগারেট ইত্যাদির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্যও এক্সরে ব্যবহার করা হয়।

২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঃ রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের ক্ষেত্রে এক্সরের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বাধিক ব্যবহারের কারণেই এক্সরে জনসাধারণের কাছে বহুল পরিচিত। এক্সরের ভেদন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রেডিওগ্রাফি গ্রহণ করা হয়। কোমল এক্সরে মাংসপেশী ভেদ করতে পারে কিন্তু হাড় বা ধাতু ভেদ করে যেতে পারে না। কোমল এক্সরে ব্যবহার করে দেহের হাড় ভাঙলে, কোনো অবাঞ্ছিত বস্তু যেমন বন্দুকের গুলি, দুর্ঘটনায় কোনো ধাতব বস্তু দেহে প্রবেশ করলে, পাকস্থলি বা মুত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা সনাক্ত ও অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। এজন্য শল্য চিকিৎসায় যুগান্তকারী উন্নতি সাধনের জন্য এক্সরের অবদান অকল্পনীয়। এছাড়াও ফুসফুসের কোনো ক্ষত, পরিপাক নালীতে ক্ষত বা টিউমার, দাঁতের গোড়ায় আলসার ইত্যাদি নির্ণয়ে এক্সরে সর্বদাই ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসায় এবং কোনো কোনো চর্মরোগ নিরাময়ে এক্সরে ব্যবহার করা হয়।

৩. বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ঃ কেলাসের গঠণ সংক্রান্ত পরীক্ষায়, অণু-পরমাণুর গঠন বিষয়ক গবেষণায় এক্সরের ব্যবহার করা হয়।

৪. গোয়েন্দা বিভাগে ঃ চোরাচালান ধরার জন্য কাঠের, ধাতব বাক্সে বা চামড়ার থলিতে বিস্ফোরক, নিষিদ্ধ বস্তু লুকানো থাকলে কিংবা কেউ গহনা বা মুদ্রা গলাধকরণ করলে তা সন্ধানের জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এমনকি হত্যাকান্ড অনুসন্ধানেও এক্সরে প্রয়োগ করা হয়।

সার-সংক্ষেপঃ

এক্সরে ঃ কোন উপায়ে ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করে সেই ত্বরান্বিত ইলেকট্রনগুলো কোনো ধাতব পদার্থের উপর নিক্ষেপ করা হলে ঐ পদার্থের ভিতরের ইলেকট্রন দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে ত্বরান্বিত ইলেকট্রনগুলোর মন্দন হয় এবং গতি শক্তি হারায়। এই হারানো গতি শক্তি $E=hf$ আকারে রশ্মিতে পরিণত হয়। একে এক্সরে বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. ক্ষরণ নলে কত চাপে ক্যাথোড রশ্মি উৎপন্ন হয়?

ক. 10^{-1} mmHg খ. 10^{-2} mmHg
গ. 10^{-3} mmHg ঘ. 10^{-4} mmHg

২. সাধারণ আলোর তুলনায়-

i. এক্সরের কম্পাংক বেশী ii. এক্সরের ভেদন ক্ষমতা বেশী iii. এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশী

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii. গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ২ ঃ তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

১.তেজস্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার ও বিপদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৪.২.১ তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

আগে ধারণা করা হতো পরমাণু অবিভাজ্য। স্যার জে. জে. থমসন (Sir J. J. Thomson) ইলেকট্রন আবিষ্কার করার ফলে বিজ্ঞনীরা পরমাণু সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। সর্বপ্রথম স্যার জে. জে. থমসন পরমাণুর একটি মডেল প্রদান করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড (Rutherford) বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন ভাবে একটি পরমাণু মডেল প্রদান করেন। এটি রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল নামে পরিচিত। তার মতে পরমাণুর মাঝে ধনাত্মক আধানগুলো পরমাণুর মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে না থেকে পরমাণুর কেন্দ্রে অতিক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে। এই অঞ্চলকে নিউক্লিয়াস বলে এবং ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হচ্ছে। পরবর্তিতে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক (Chadwick) নিউট্রনের আবিষ্কার করেন। নিউট্রনও নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।

প্রকৃতিতে এমন কতকগুলি পরমাণু পাওয়া যায় যারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে উচ্চ ভেদনদক্ষমতা সম্পন্ন গামা রশ্মি, বিটা কণিকা ও আলফা কণিকা বিকিরণ করে। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি এ ধরণের পরমাণু। স্বতঃস্ফুর্তভাবে রশ্মি বিকিরণের প্রক্রিয়াকেই তেজস্ক্রিয়তা বলে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকেরেল (Henry Becquerel) আকস্মিকভাবে এ রশ্মি আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রশ্মির নাম দেয়া হয় "বেকেরেল রশ্মি"। পরবর্তিতে মাদাম কুরী (Madame Marie Curie) এবং তাঁর স্বামী পিয়ারে কুরী (Pierre Curie) নানা পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই রশ্মি বর্তমানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive rays) নামে পরিচিত।

পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রশ্মি বিকিরণের প্রক্রিয়াকেই তেজস্ক্রিয়তা বলে।

তেজস্ক্রিয়তা দুই প্রকার। যথাঃ- প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা।

প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা ঃ- কোনো পদার্থ হতে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তাকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা বলে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ঃ- কৃত্রিম উপায়ে কোনো মৌলকে তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত করলে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে তাকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বলে।

১৪.২.২ তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য (Features of Radioactivity

বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মি পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

১। তেজস্ক্রিয়তা একটি স্বতঃস্ফুর্ত ও অবিরাম ঘটনা। তাপ, চাপ, তড়িৎ ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র অথবা কোনো ভৌত কারণ দ্বারা তেজস্ক্রিয়তা প্রভাবিত হয় না।

২। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণিকা (α), বিটা কণিকা (β) ও গামা রশ্মি (γ)নির্গত হয়।

৩। তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তি স্থল হলো নিউক্লিয়াস। পরমাণুর ভাঙ্গনের ফলেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয়তার ফলে এক প্রকার পরমাণু অন্য এক প্রকার পরমাণুতে পরিণত হয়।

৪। এটি একটি অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া।

১৪.২.৩ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বৈশিষ্ট্য (Nature of Radioactive Radiation)

তেজস্ক্রিয়তা আবিস্কারের পর বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরী একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণে তিন ধরণের রশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। চিত্র নং ১৪.২ এ মাদাম কুরীর পরীক্ষার চিত্র দেখানো হলো। একটি সরু ও লম্বা ছিদ্র বিশিষ্ট একটি সীসার পাত্রে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখা হয়। পাত্রের ছিদ্র দিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সমান্তরালভাবে নির্গত হয়। ছিদ্রের উপরে এবং রশ্মির লম্বভাবে তড়িৎ ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়। এরপর এর উপরে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখা হয়। সমগ্র ব্যবস্থাটি বায়ুশূন্য করা হয় যেন রশ্মিগুলো বায়ু দ্বারা শোষিত না হয়। ফটোগ্রাফিক প্লেটে কিছুক্ষণ ধরে রশ্মি ফেলার পর প্লেটটি ডেভেলাপ করলে দেখা যায় যে প্লেটে তিনটি কালো দাগ পড়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তিন ধরণের রশ্মি নির্গত হয় । যে রশ্মিটি ধনাত্মক পাতের দিকে বেঁকে গেছে সেটি ঋণাত্মক আধান গ্রস্থ। যে রশ্মিটি ঋণাত্মক পাতের দিকে বেঁকে গেছে সেটি ধনাত্মক আধান গ্রস্থ। আর যে রশ্মিটি কোনো দিকেই বিচ্যুত হয়নি সেটি তড়িৎ নিরপেক্ষ। ধনাত্মক আধান গ্রস্থ রশ্মিকে আলফা (α) রশ্মি, ঋণাত্মক আধান গ্রস্থ রশ্মিকে বিটা (β) রশ্মি এবং তড়িৎ নিরপেক্ষ রশ্মিকে গামা (γ) রশ্মি বলে।

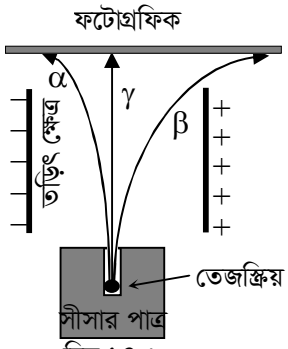

চিত্র ১৪.২

মনে রাখুন ঃ
১। আলফা ও বিটা রশ্মি হলো কণা প্রবাহ কিন্তু গামা রশ্মি হলো তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ।
২। গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর চেয়ে অনেক কম। একে চেখে দেখা যায় না।

১৪.২.৩.১ আলফা কণিকার ধর্ম ও প্রকৃতি (Properties and Nature of α-particle)

১। আলফা কণিকা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত অর্থাৎ এটি আয়নিত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এর ভর 6.6×10^{-27} কেজি।
২। ইহা ধণ চার্জ বহন করে। এর পরিমাণ 3.2×10^{-19} কুলম্ব
৩। এর শক্তি 1MeV বা $1.6\times10^{-13}\text{J}$ হতে 9MeV বা $1.44\times10^{-12}\text{J}$ পর্যন্ত হয়।
৪। এই রশ্মি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
৫। এর আয়নিত করার ক্ষমতা খুব বেশী। β-কণিকার চেয়ে প্রায় 100 গুণ এবং γ-কণিকার চেয়ে প্রায় 1000 গুণ বেশী।
৬। এটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর বিক্রিয়া করে।
৭। ইহা সহজেই বস্তু দ্বারা শোষিত হয়। এর ভেদন ক্ষমতা খুব কম।
৮। জিংক সালফাইডে আলফা কণিকা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
৯। ধাতব প্লেটের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলফা কণিকার কণাগুলো চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

১৪.২.৩.২ বিটা কণিকার ধর্ম ও প্রকৃতি (Properties and Nature of β-particle)

১। বিটা কণিকা খুব হালকা। এরা ইলেকট্রন প্রবাহ। এর ভর 9.1×10^{-31} কেজি।
২। এরা ঋণ চার্জ বহন করে। এই চার্জের মান 1.6×10^{-19} কুলম্ব।
৩। তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে বিটা কণিকা প্রচন্ড বেগে নির্গত হয়। এর বেগ প্রায় $0.9\times10^{8}\text{ms}^{-1}$ পর্যন্ত হয়ে থাকে।
৪। এই কণিকা তড়িৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
৫। এর আয়নিত করার ক্ষমতা আছে, তবে আলফা কণিকা অপেক্ষা কম।
৬। এটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর বিক্রিয়া করে।
৭। ইহা সহজেই বস্তু দ্বারা শোষিত হয়। এর ভেদন ক্ষমতা আলফা কণিকা অপেক্ষা বেশী।
৮। জিংক সালফাইডে বিটা কণিকা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
৯। ধাতব প্লেটের মধ্যদিয়ে যাবার সময় বিটা কণিকাগুলো চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। আলফা কণিকা অপেক্ষা অনেক বেশী বিক্ষিপ্ত হয়।

১৪.২.৩.৩ গামা রশ্মির ধর্ম ও প্রকৃতি (Properties and Nature of γ-ray)

১। গামা রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গ।
২। এই রশ্মি আলোর বেগে গতিশীল।
৩। এর কোন চার্জ ও ভর নাই।
৪। এই রশ্মি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
৫। এটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর বিক্রিয়া করে।
৬। এর আয়নিত করার ক্ষমতা আছে তবে বিটা রশ্মি অপেক্ষা কম।
৭। জিংক সালফাইডে গামা রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
৮। গামা রশ্মির প্রতিলন, প্রতিসরণ, ব্যাতিচার, অপবর্তন ইত্যাদি সব আলোকীয় ধর্ম আছে।

সার-সংক্ষেপঃ

তেজস্ক্রিয়তা ঃ অস্থিতিশীল পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রশ্মি বিকিরণের প্রক্রিয়াকেই তেজস্ক্রিয়তা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তেজস্ক্রিয় বিকিরণে কোন কোন কণিকা নির্গত হয়?
ক. ইলেকট্রন ও প্রোটন খ. প্রোটন ও নিউট্রন
গ. প্রোটন ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ঘ. ইলেকট্রন ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াস

২. আলফা রশ্মি হলো
ক. ইলেকট্রন খ. প্রোটন গ. নিউট্রন ঘ. হিলিয়াম নিউক্লিয়াস

৩. বিটা রশ্মি হলো
ক. ইলেকট্রন খ. প্রোটন গ. নিউট্রন ঘ. হিলিয়াম নিউক্লিয়াস

পাঠ ৩ ঃ ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

১. এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. p - টাইপ ও n -টাইপ অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. ডায়োড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.সমন্বিত বর্তনী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৪.৩.১.এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (Analogue and Digital Electronics)

বিশেষ কোনো প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অনেকগুলি ইলেকট্রনিক্স বর্তনীকে সমষ্টিগতভাবে ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি বলা হয়। কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেডিও, ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি বহুল পরিচিত ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতির উদাহরণ। বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. এনালগ পদ্ধতি (analogue system)
২. ডিজিটাল পদ্ধতি (digital system)
৩. মিশ্র পদ্ধতি (hybrid system)

এনালগ পদ্ধতি ঃ

এনালগ সংকেত হলো অবিচ্ছিন্ন তড়িৎ সংকেত। এনালগ সংকেত অনেকটা শব্দ তরঙ্গের মত সময়ের সাথে সাথে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মান বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছিয়ে আবার অবিচ্ছিন্ন ভাবে কমতে কমতে সর্বনিম্ন মানে পৌছায়। এই সংকেতকে সাইন তরঙ্গের (sine wave) সাথে তুলনা করা যায়।

চিত্র ১৪.৩ ক

এনালগ পদ্ধতিতে ক্রম-পরিবর্তনশীল(analogue) সংকেতের বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রা, চাপ, প্রবাহ হলো ক্রমাগত পরিবর্তনশীল কয়েকটি এনালগ সংকেতের উদাহরণ। এসব সংকেতকে ভোল্টেজে রূপান্তরিত করলে যে ক্রম-পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাই হলো এনালগ সংকেতের উদাহরণ (চিত্র ১৪.৩ ক)। এ ধরণের প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিবর্ধক, ফিল্টার প্রভৃতি এনালগ বর্তনী ব্যবহার করা হয়। রেডিও, টেপ রেকর্ডার, টিভি ইত্যাদি হলো কয়েকটি এনালগ ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতির উদাহরণ।

ডিজিটাল পদ্ধতি ঃ

ডিজিটাল সংকেত হলো বিচ্ছিন্ন তড়িৎ সংকেত। এই সংকেতের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান আছে। এই দুই মানের মাঝে অন্য কোনো স্তর নাই। সময়ের সাথে এর মান হয় সর্বোচ্চ না হয় সর্বনিম্ন মানে পরিবর্তিত হয়। এই সংকেত চৌকো তরঙ্গের (square waves) মত (চিত্র ১৪.৩ খ)।

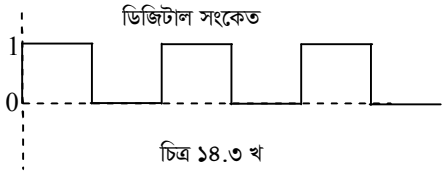

চিত্র ১৪.৩ খ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্রম-পরিবর্তনশীল এনালগ সংকেতের বদলে স্তর পরিবর্তনশীল সংকেত ব্যবহার করা হয়। এই সংকেতকে ডিজিটাল বা বাইনারী (binary) সংকেত বলা হয়। দুটি পৃথক অবস্থায় কাজ করে এমন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে এই সংকেত পাওয়া যায়। যেমন ট্রানজিস্টারের সচল বা অন (on) এবং অচল বা অফ (off) অবস্থা দ্বারা দুটি পৃথক অবস্থা বোঝানো সম্ভব। প্রজ্জ্বলিত বাতি এবং নির্বাপিত বাতি অথবা টেপের চৌম্বকায়িত অবস্থা বা অচৌম্বকায়িত অবস্থা দিয়ে ডিজিটাল সংকেতের স্তর দুটিকে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব। ডিজিটাল সংকেতের স্তর দুটিকে 0 এবং ১ (0 and 1), সত্য এবং মিথ্যা (true and false), কিম্বা উচ্চ এবং নিম্ন (high and low) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতির জনপ্রিয় উদাহরণ।

মিশ্র পদ্ধতি ঃ

এনালগ ও ডিজিটাল বর্তনীর সংমিশ্রণে তৈরি পদ্ধতিকে মিশ্র ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি বলে। শিল্প-কারখানায় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মিশ্র ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। চাপ, তাপমাত্রা, রক্তচাপ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, তরল পদার্থের স্তর ইত্যাদি ক্রম-পরিবর্তনশীল বিষয় সংগৃহীত উপাত্ত এনালগ ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই উপাত্তগুলিকে ডিজিটাল ইলেট্রনিক পদ্ধতিতে যথাযোগ্য সংখ্যা ও সংকেতে রূপান্তর করে পাঠ নেয়া হয়।

নীচে এনালগ এবং ডিজিটাল সংকেতের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

১. এনালগ সংকেত একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ এবং ভৌত পরিমাপযোগ্য অপরদিকে ডিজিটাল সংকেত একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ এবং সংখ্যা (বাইনারী পদ্ধতি) দিয়ে পরিমাপ করা হয়।

২. এনালগ সংকেতকে সাইন তরঙ্গ দিয়ে এবং ডিজিটাল সংকেতকে চৌকো তরঙ্গ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৩. ডিজিটাল সংকেতের তুলনায় এনালগ সংকেত সঞ্চালন অনেক ব্যয়বহুল এবং বেশী শক্তি খরচ হয়।

৪. এনালগ সংকেতের তুলনায় ডিজিটাল সংকেত সঞ্চালন পদ্ধতি অনেক সহজ।

৫. এনালগ সংকেত তরঙ্গ আকারে এবং ডিজিটাল সংকেত 0 এবং 1 অর্থাৎ বাইনারী আকারে সংরক্ষণ করা হয়।

৬. মোডেমের মাধ্যমে এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে এবং ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তর করা যায়।

৭. কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানের জন্য ডিজিটাল সংকেতে বাইনারী পদ্ধতি ব্যবহার করে।

৮. ডিজিটাল সংকেত প্রেরণ করা তুলনামূলক সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রায় ত্রুটিমুক্ত।

৯. এনালগ সংকেত হলো শব্দ তরঙ্গের প্রতিরূপ। এটি সঞ্চালনের সময় পথিমধ্যে বিকৃত হয়ে যায়, গুণগত মান ঠিক থাকে না এবং তীব্রতা হ্রাস পায়।

১০. এনালগ সংকেতের তুলনায় ডিজিটাল সংকেত সঞ্চালন হার অনেক দ্রুত এবং সংকেতের গুণগত মান উন্নত।

১১. রেডিও, টিভি, টেলিফোন, অডিও, ভিডিও ইত্যাদিতে এনালগ সংকেত ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে কম্পিউটার, সিডি, ডিভিডি, মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট কম্যুনিকেশন ইত্যাদিতে ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করা হয়।

১৪.৩.২ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে আধান সহজে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হতে পারে সে সব পদার্থকে পরিবাহী বলে, যেমন-রুপা, তামা, লোহা ইত্যাদি। মূলতঃ সকল ধাতব পদার্থই পরিবাহী। পরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{-8}\Omega m$ ক্রমের। পরিবাহীতে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। পরিবাহীর দুই প্রান্তে সামান্য বিভব পার্থক্য ঘটালেই ইলেকট্রনগুলো তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। পরিবাহী পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলে এর তড়িৎ প্রবাহে বাধা দান করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে আধান প্রবাহিত হতে পারে না সে সব পদার্থকে অপরিবাহী বলে, যেমন-কাচ, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি। মূলত প্রায় সকল অধাতব পদার্থই অপরিবাহী। অপরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{12}\Omega m$ ক্রমের। অপরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। তাই অপরিবাহীর দুই প্রান্তে অনেক বিভব পার্থক্য ঘটালেও তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় না। অপরিবাহী তড়িৎ প্রবাহে বাধা দান করে।

কিছু কিছু পদার্থ আছে যেমন- জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি যার তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের মাঝামাঝি অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ করতে পারে কিন্তু তা পরিবাহীর চেয়ে অনেক কম, কিন্তু অপরিবাহীর চেয়ে বেশী এদেরকে অর্ধপরিবাহী বলে। পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, পরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তড়িৎ প্রবাহের ক্ষমতা হ্রাস পায়, কিন্তু অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তড়িৎ প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায়, আর অর্ধপরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়। অর্ধপরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\Omega m$ ক্রমের।

ইলেকট্রনিক্স হলো পদার্থবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাতে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রন হলো এমন একটি মৌলিক কণিকা যার ভর উপেক্ষণীয় এবং এর নির্দিষ্ট তড়িৎ আধান রয়েছে। ফলে এদের তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং ভর নগন্য হওয়ায় এজন্য খুব অল্প শক্তির প্রয়োজন হয়। ধাতুতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যার জন্য ধাতুর উচ্চ তড়িৎ পরিবাহীতা আছে। এই ইলেকট্রনগুলো ধাতুপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ায় এবং সাধারণ তাপমাত্রায় ধাতুর তল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই ধাতু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করতে বেশ কিছু পরিমাণ শক্তির সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়।

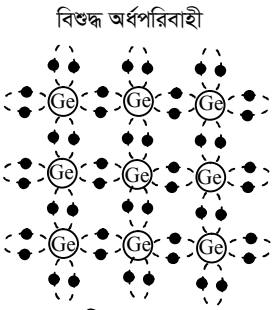

চিত্র ১৪.৪

ইলেকট্রনের আরো একটি উৎস আছে সেটি হলো অর্ধপরিবাহী। অর্ধপরিবাহীদের উতপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজন হয় না। কারণ এক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলোকে অর্ধপরিবাহীর গাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন না করে পদার্থের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জার্মেনিয়াম ও সিলিকন হলো দুটি বহুল ব্যবহৃত অর্ধপরিবাহী। আমরা এখানে জার্মেনিয়াম পরমাণু নিয়ে আলোচনা করছি। সিলিকনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা হবে। জার্মেনিয়াম পরমাণুতে 32 টি ইলেকট্রন এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে বহিস্থ কক্ষপথে 4টি ইলেকট্রন থাকে। জার্মেনিয়াম পরমাণুর এই চারটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটি প্রতিবেশী চারটি অন্য পরমাণুর একটি করে যোজনী ইলেকট্রনের সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করে (চিত্র ১৪.৪)। তাই সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রনে পূর্ণ পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ এই অবস্থায় কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু ইলেকট্রন তাপীয় উত্তেজনায় সমযোজী বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলেকট্রনটি মুক্ত হয়ে যায় এবং বন্ধনে ইলেকট্রনের ঘাটতি ঘটায়। ইলেকট্রনের এই জায়গায় গর্তের অর্থাৎ হোলের (Hole) সৃষ্টি হয়। এই হোলগুলো ধনাত্মক আধানে আহিত কণার ন্যায় আচরণ করে। এই হোলগুলো তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে এই অবস্থায় ইলেকট্রন ও হোল উভয়ই একই দিকে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই তড়িৎ

প্রবাহ খুব ক্ষীণ হয়। অর্ধপরিবাহীতে খুব অল্প পরিমাণে (10^6টি অর্ধপরিবাহীতে এক হতে দুটি) কোনো বিশেষ অপদ্রব্য (impurity) যুক্ত করে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে ডোপিং (doping) বলে। ডোপিং-এর উপর নির্ভর করে দুই ধরণের অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায়। একটি জার্মেনিয়াম কেলাসে অর্সেনিক (Z=33 ও 5টি যোজন ইলেকট্রন) অপদ্রব্য হিসাবে যুক্ত করলে কেলাস গঠন অক্ষুন্ন রেখে যুক্ত আর্সেনিক পরমাণুগুলো সমসংখ্যক জার্মেনিয়াম প্রতিস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়ায় কেলাসের ভৌত গঠন অপরিবর্তিত থাকে। এ ক্ষেত্রে আর্সেনিকের পরমাণুর 5টি যোজন ইলেকট্রনের চারটি প্রতিবেশী পরমাণুর সঙ্গে সমযোজী বন্ধন গঠন করে আর আর্সেনিকের পঞ্চম যোজনী ইলেকট্রনটি মুক্তভাবে থাকে (চিত্র ১৪.৫ ক)। এই মুক্ত ইলেকট্রনটি অর্ধপরিবাহীর এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে মুক্তভাবে ও অনিয়মিতভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই অপদ্রব্য যেহেতু জার্মেনিয়াম কেলাসে ইলেকট্রন দান করে থাকে তাই এদেরকে দাতা অপদ্রব্য (Donor Impurity) বলে এবং কেলাসটিকে n-টাইপ বলা হয়। অতি অল্প পরিমাণ আর্সেনিক যুক্ত করলেও এত বেশী মুক্ত ইলেকট্রন দেয় যে কেলাসের পরিবাহিতা প্রায় 1000 গুণ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু n-টাইপ কেলাসে প্রতিটি পরমাণু সমান পরিমাণ ইলেকট্রন প্রোটন থাকে সেহেতু কেলাসটি তড়িৎ নিরপেক্ষ। কোন কারণে কেলাস থেকে ইলেকট্রন চলে গেলে কেলাসটি ধন-চার্জ গ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই জন্য n-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে চিত্র ১৪.৫(খ) দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

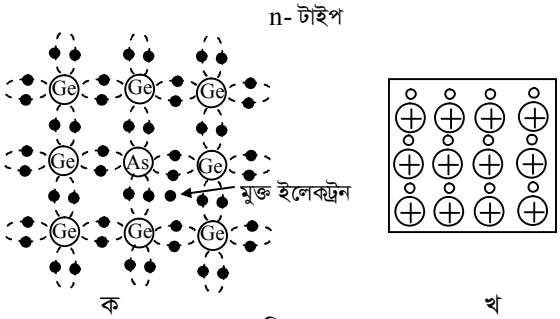

চিত্র ১৪.৫

জার্মেনিয়াম কেলাসে যখন অ্যালুমিনিয়াম (Z=13 ও 3টি যোজন ইলেকট্রন) অপদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা একটি নিকটবর্তী সমযোজী বন্ধন থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে প্রতিবেশী জার্মেনিয়ামের পরমাণুর সঙ্গে চারটি সমযোজী বন্ধন সম্পূর্ণ করে। একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করায় একটি হোলের সৃষ্টি হয় যা নিকটবর্তী সমযোজী বন্ধন থেকে ইলেকট্রন নিয়ে পূর্ণ হতে পারে এবং এর ফলে সেখানে হোলের উদ্ভব হয় (চিত্র ১৪.৬ ক)। এই ভাবে হোলগুলো মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। এ জাতীয় অপদ্রব্য যেহেতু জার্মেনিয়াম বন্ধন থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই এদের গ্রহীতা অপদ্রব্য বলে। (Acceptor Impurity) বলে এবং কেলাসটিকে p-টাইপ বলা হয়। অতি অল্প পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম যুক্ত করলেও এত বেশী হোল পাওয়া যায় যে কেলাসের পরিবাহিতা প্রায় 1000 গুণ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু p-টাইপ কেলাসে প্রতিটি পরমাণুর সমান পরিমাণ ইলেকট্রন প্রোটন থাকে সেহেতু কেলাসটি তড়িৎ নিরপেক্ষ।

n-টাইপ কেলাসে ইলেকট্রনের আধিক্য থাকায় এতে ইলেকট্রনগুলিকে গুরু বাহক (Majority Carriers) এবং হোলগুলিকে লঘু বাহক (Minority Carriers) বলে। p-টাইপ কেলাসে হোলের আধিক্য থাকায় এতে হোলগুলিকে গুরু বাহক (Majority Carriers) এবং ইলেকট্রনগুলিকে লঘু বাহক (Minority Carriers) বলে। বাহির থেকে কোনো ইলেকট্রন এসে এই হোল পূরণ করলে কেলাসটি ঋণ-চার্জ গ্রস্থ হয়ে পরে। এই জন্য p-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে চিত্র ১৪.৬(খ) দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

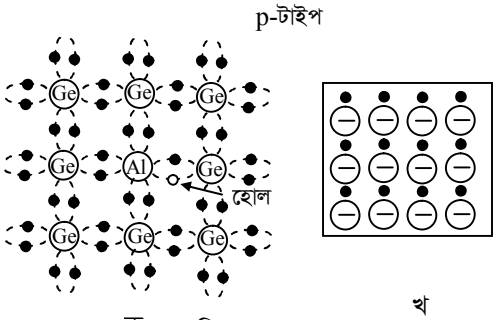

চিত্র ১৪.৬

১৪.৩.৩ অর্ধপরিবাহী ডায়োড, p-n সংযোগ (Semiconductor Diode, p-n Junction)

একটি p-টাইপ কেলাসকে একটি n-টাইপ কেলাসের সাথে যুক্ত করলে (প্রকৃতপক্ষে একটি অর্ধপরিবাহী খণ্ডে দুই ধরণের কেলাস সৃষ্টি করা হয়) একটি p-n সংযোগ বা অর্ধপরিবাহী ডায়োড তৈরি হয় (চিত্র ১৪.৭ ক)। p-অঞ্চলে হোলের এবং n-অঞ্চলে মুক্ত ইলেকট্রনের আধিক্য বেশী থাকে। তাই p-অঞ্চল থেকে কিছু

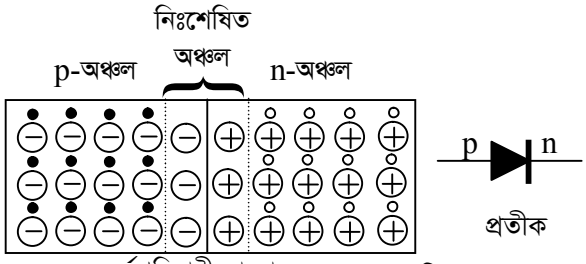

চিত্র ১৪.৭ (ক)
চিত্র ১৪.৭ (খ)

হোল এবং n-অঞ্চল থেকে কিছু মুক্ত ইলেকট্রনের সংযোগের নিকটবর্তী অংশে যথাক্রমে p-অঞ্চলে ও n-অঞ্চলে ব্যাপন ঘটে। এর ফলে সংযোগের কাছে p-অঞ্চল ও n-অঞ্চল যথাক্রমে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক হয়ে পড়ে। তাই ঋণাত্মকভাবে আহিত p-অঞ্চলে এবং ধনাত্মকভাবে আহিত n-অঞ্চলে যথাক্রমে p-অঞ্চল থেকে হোলের এবং n-অঞ্চল থেকে ইলেকট্রনের সঞ্চারণ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য p-n সংযোগ তলে p-অঞ্চল ঋণাত্মক এবং n-অঞ্চল ধনাত্মক হয়ে পড়ে। সংযোগের দুই দিকে এরকম বিপরীত আধান জমা হওয়ার ফলে সংযোগ স্থলে একটি বিভব প্রাচীরের (Potential barrier) সৃষ্টি হয় যাকে নিঃশেষিত অঞ্চল (Depletion Zone) বলা হয় (চিত্র ১৪.৭ ক)। ১৪.৭ খ চিত্রে ডায়োডের প্রতীক দেখানো হয়েছে।

একটি p-n সংযোগকে বর্তনীর মত কোষের সাথে যুক্ত করা হলে যদি p-অঞ্চলে কোষের ধনাত্মক প্রান্ত এবং n-অঞ্চলে কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত যুক্ত করা হয় তবে এই সংযাগটিকে সম্মুখ ঝোঁক (Forward Bias) বলে। আর যদি p-অঞ্চলে কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত এবং n-অঞ্চলে কোষের ধনাত্মক প্রান্ত যুক্ত করা হয় তবে এই সংযোগটিকে বিপরীত ঝোঁক (Reverse Bias) বলে।

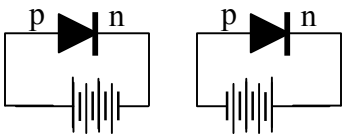

চিত্র ১৪.৮

সম্মুখ ঝোঁক সংযোগে n-অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে সংযোগস্থলের দিকে অগ্রসর হয় এবং একইভাবে p-অঞ্চলের হোলগুলো কোষের ধনাত্মক প্রান্ত দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে সংযোগস্থলের দিক অগ্রসর হয়। এর ফলে নিঃশেষিত অঞ্চলের প্রস্থ কমে যায় ও বিভব প্রাচীর হ্রাস পায়। সেজন্য p-অঞ্চলের হোলগুলো বিভব প্রাচীর অতিক্রম করে n-অঞ্চলে চলে আসে এবং n-অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো বিভব প্রাচীর অতিক্রম করে p-অঞ্চলে চলে আসে। তাই সম্মুখ ঝোঁকে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ হয়।

বিপরীত ঝোঁক সংযোগে n-অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো কোষের ধনাত্মক প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সংযোগস্থল থেকে প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয় এবং একইভাবে p-অঞ্চলের হোলগুলো কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সংযোগস্থল থেকে প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। এর ফলে নিঃশেষিত অঞ্চলের প্রস্থ বৃদ্ধি যায় ও বিভব প্রাচীর বৃদ্ধি পায়। সেজন্য p-অঞ্চলের হোলগুলো বিভব প্রাচীর অতিক্রম করে n-অঞ্চলে চলে আসতে পারে না এবং n-অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলো বিভব প্রাচীর অতিক্রম করে p-অঞ্চলে চলে আসতে পারে না। সুতরাং বিপরীত ঝোকে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ হয় না। সে কারণে p-n সংযোগ বা ডায়োড একমুখীকরণ হিসাবে কাজ করে। তাই p-n সংযোগ বা ডায়োডকে রেক্টিফায়ার বলা হয়।

১৪.৩.৪ ট্রানজিস্টার (Transistor) ঃ

ট্রানজিস্টার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যাতে দুটি চওড়া p-টাইপ কেলাসের মধ্যে একটি সরু n-টাইপ কেলাস যুক্ত থাকে অথবা দুটি চওড়া n-টাইপ কেলাসের মধ্যে একটি সরু p-টাইপ কেলাস যুক্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে একটি অর্ধপরিবাহী খণ্ডের দুই প্রান্তে চওড়া করে তিনযোজী পরমাণু (অপদ্রব্য) ডোপিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে p-টাইপ কেলাস এবং এদের মধ্যে সরু করে পাঁচযোজী পরমাণু (অপদ্রব্য) ডোপিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে n-টাইপ কেলাস গঠনের মাধ্যমে p-n-p ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। আর একটি অর্ধপরিবাহী খণ্ডের দুই প্রান্তে চওড়া করে পাঁচযোজী পরমাণু (অপদ্রব্য) ডোপিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে n-টাইপ কেলাস এবং এদের মধ্যে সরু করে তিনযোজী পরমাণু প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে n-টাইপ কেলাস গঠনের মাধ্যমে n-p-n ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। তাই একটি ট্রানজিস্টারকে দুটি ডায়োডকে পিঠাপিঠি (Back to back) যুক্ত বলে ধরা হয়। চিত্র নং ১৪.৯(ক) তে p-n-p ট্রানজিস্টার এবং চিত্র নং ১৪.১০(ক) তে n-p-n ট্রানজিস্টার দেখানো হয়েছে। মধ্যের সরু অংশকে ট্রানজিস্টারের বেস (Base) বা ভূমি বলে। প্রান্তের যে অংশের চওড়া অপর প্রান্তের চেয়ে তুলনামূলক কম এবং অপদ্রব্যের অনুপাত একটু বেশী তাকে এমিটার (Emiter) বা

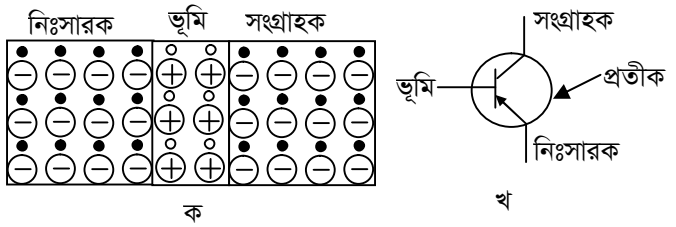

p-n-p ট্রানজিস্টার

চিত্র ১৪.৯

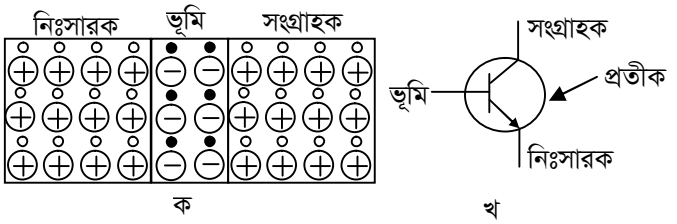

n-p-n ট্রানজিস্টার

চিত্র ১৪.১০

নিঃসারক এবং যে প্রান্তের চওড়া একটু বেশী এবং অপদ্রব্যের অনুপাত বেসের সমান তাকে কালেক্টর (Collector) বা সংগ্রাহক বলে। ১৪.৯(খ) চিত্রে p-n-p ট্রানজিস্টরের এবং ১৪.১০ (খ) চিত্রে n-p-n ট্রানজিস্টরের প্রতীক দেখানো হয়েছে। ভূমির সাপেক্ষে নিঃসারককে সম্মুখ ঝোঁক এবং ভূমি বা বেসের সাপেক্ষে সংগ্রাহককে বিপরীত ঝোঁকে রাখা হয়। n-p-n ট্রানজিস্টারে নিঃসারকের সাপেক্ষে ভূমিকে ধনাত্মক বিভব প্রয়োগ করলে সম্মুখ ঝোঁক হওয়ায় নিঃসারক ও ভূমির সংযোগস্থলে বিভব প্রাচীরের মান হ্রাস পায় ও ইলেকট্রন সীমানা অতিক্রম করে ভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করে। ভূমির চওড়া অত্যন্ত কম হওয়ায় এই অঞ্চলে আগত ইলেকট্রনের 2% থেকে 5% এর বেশী থাকতে পারে না। নিঃসারকের সাপেক্ষে সংগ্রাহকে ভূমির তুলনায় উচ্চ ধনাত্মক বিভব প্রয়োগ করলে ভূমির তুলনায় বিপরীত ঝোঁক হওয়ায় ভূমি থেকে হোল সংগ্রাহকে আসতে পারে না। কিন্তু ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে। ফলে ভূমি অঞ্চলের অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলো সংগ্রাহকে চলে যায়। ভূমির বিভব নিয়ন্ত্রণ করে সংগ্রাহকে ইলেকট্রন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। p-n-p ট্রানজিস্টারে n-p-n ট্রানজিস্টারে বিপরীত ভাবে ঝোঁক প্রদান করে একই প্রক্রিয়ায় সংগ্রাহকে হোল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
যেহেতু ভূমির বিভব ক্ষুদ্র পরিবর্তন করে সংগ্রাহকের অনেক বেশী আধান প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে ট্রানজিস্টার বিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।

১৪.৩.৫ সমন্বিত বর্তনী বা আই, সি (Integrated Circuits or IC)

ইলেকট্রনিক্সের একটি শাখা হলো মাইক্রোইলেকট্রনিক্স। মাইক্রোইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে অতিক্ষুদ্র পরিসরে ইলেকট্রনিক্স বর্তনী তৈরি করা যায়। এই বর্তনীগুলোকে বলে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স সার্কিট (microelecrtonic circuit) বা ইনট্রিগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit) বা সমন্বিত বর্তনী। সমন্বিত বর্তনী বা আই, সি-এর মধ্যে একটি পূর্ণ বর্তনী তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রাংশ একত্রে মাইক্রো প্রযুক্তির সাহায্য তৈরি করা হয়। ফলে আলাদা আলাদা ট্রানজিস্টার, রোধ, ডায়োড ইত্যাদি পরস্পরের সাথে সংযোগ করে তৈরি করার দরকার হয় না।

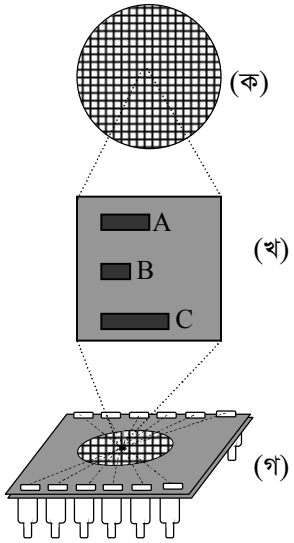

চিত্র ১৪.১১

চিত্র ১৪.১১(ক) -তে দেখানো হয়েছে একটি 0.5cm পুরু পাতলা সিলিকনের পাত। এর ব্যাসার্ধ 0.25cm থেকে 10cm পর্যন্ত হয়ে থাকে। একে সিলিকন ওয়েফার (silicon wafer) বলে।
চিত্র নং ১৪.১১(খ) -তে দেখানো হয়েছে সিলিকন ওয়েফারের একটি ক্ষুদ্র অংশ, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 0.127mm ও 0.127mm। সিলিকন ওয়েফারের এই ক্ষুদ্র অংশকে সিলিকন চিপ (silicon chip) বলে [চিত্র নং ১৪.১১(খ)]। এই চিপের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান যেমন, রোধ, আবেশক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টার, লজিক গেট ইত্যাদি ডোপিং প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি রোধ তৈরির জন্য জায়গার দরকার হয় $0.0165\text{mm} \times 0.0102\text{mm}$ [চিত্র নং ১৪.১১(খ A)]। একটি ডায়োড তৈরির জন্য জায়গার প্রয়োজন $0.0165\text{mm} \times 0.0102\text{mm}$ [চিত্র নং ১৪.১১(খ B)]। একটি ট্রানজিস্টার গঠনের জন্য জায়গার প্রয়োজন $0.0305\text{mm} \times 0.0051\text{mm}$ [চিত্র নং ১৪.১১(খ C)]। এই সব উপাদানগুলো প্রয়োজনীয় বর্তনী অনুসারে অভ্যন্তরীণ ভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।
চিত্র নং ১৪.১১(গ) -তে দেখানো হয়েছে সিলিকন ওয়েফারকে কিভাবে সমন্বিত বর্তনীর খোলের (casing) মধ্যে বসানো হয়। এর পিনগুলো অভ্যন্তরীণ ভাবে সিলিকন চিপের বর্তনীর সাথে যুক্ত করা হয়। এই পিনগুলোর বাহির প্রান্তের সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগ বাহির থেকে দেয়া হয়।
সমন্বিত বর্তনীর মধ্যে উপাদানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমন্বিত বর্তনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়।
১। মধ্যম মাত্রার সমন্বিত বর্তনী বা MSI (Medium Scale Integrated Circuits) ঃ এই জাতীয় সমন্বিত বর্তনীতে প্রায় ১০০টি উপাদান থাকে।
২। বড় মাত্রার সমন্বিত বর্তনী বা LSI (Large Scale Integrated Circuits) ঃ এই জাতীয় সমন্বিত বর্তনীতে প্রায় ১০০০টি উপাদান থাকে।
৩। অতি বড় মাত্রার সমন্বিত বর্তনী বা VLSI (Very Large Scale Integrated Circuits) ঃ এই জাতীয় সমন্বিত বর্তনীতে প্রায় ১০,০০০টির অধিক উপাদান থাকে।

সমন্বিত বর্তনী ব্যবহারে সাধারণ ইলেকট্রনিক বর্তনী অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। নীচে সুবিধাগুলো দেয়া হলো।

১। সমন্বিত বর্তনী অতি উচ্চ মাত্রার নির্ভরযোগ্য বর্তনী।

২। সাধারণ ইলেকট্রনিক বর্তনীর তুলনায় অত্যন্ত কম জায়গা দখল করে।

৩। সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করলে সাধারণ ইলেকট্রনিক বর্তনীর চেয়ে অনেক কম খরচ পড়ে।

সার-সংক্ষেপঃ

অর্ধপরিবাহী ঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে আধান সহজে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হতে পারে সে সব পদার্থকে পরিবাহী বলে। পরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{-8}\Omega m$ ক্রমের।

অপরিবাহী ঃ যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে আধান প্রবাহিত হতে পারে না সে সব পদার্থকে অপরিবাহী বলে। অপরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{12}\Omega m$ ক্রমের।

পরিবাহী ঃ কিছু কিছু পদার্থ আছে যা দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ করতে পারে। তা পরিবাহীর চেয়ে অত্যন্ত কম কিন্তু অপরিবাহীর চেয়ে বেশী এদেরকে অর্ধপরিবাহী বলে। অর্ধপরিবাহী পদার্থের আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\Omega m$ ক্রমের। তাপমাত্রা বৃদ্ধি অর্ধপরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়।

আই, সি ঃ মাইক্রোইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে অতিক্ষুদ্র পরিসরে ইলেকট্রনিক্স বর্তনী তৈরি করা যায়। এই বর্তনীগুলোকে বলে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স সার্কিট বা ইনট্রিগ্রেটেড সার্কিট বা আই, সি বলে।

মধ্যম মাত্রার সমন্বিত বর্তনী বা MSI ঃ এই জাতীয় সমন্বিত বর্তনীতে প্রায় ১০০টি উপাদান থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. ঘরের তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধের ক্রম কত?

ক. $10^{-8}\Omega m$ খ. $10^{-4}\Omega m$ গ. $10^{6}\Omega m$ ঘ. $10^{11}\Omega m$

২. বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম কেলাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কেলাসটিতে-

ক. বন্ড ভেঙ্গে প্রচুর ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়
খ. বন্ড ভেঙ্গে ইলেকট্রন ও হোল সৃষ্টি হয়
গ. জার্মেনিয়াম কেলাস গলে যায়
ঘ. বন্ড ভেঙ্গে প্রচুর হোল সৃষ্টি হয়

৩. কিসের চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে?

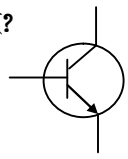

ক. অর্ধপরিবাহী ডায়োড
খ. অর্ধপরিবাহী কেলাস
গ. p-n-p ট্রানজিস্টার
ঘ. n-p-n ট্রানজিস্টার

পাঠ ৪ ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত কতিপয় ডিভাইস (Few Devices of Communication and Information Technology)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

১.রেডিও এর মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.টেলিভিশনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.টেলিফোনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.মোবাইল ফোনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.ফ্যাক্সের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৪.৪.১.১ রেডিও (Radio)

রেডিও এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে শব্দকে তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত করে একস্থান হতে অন্য স্থানে পাঠানো হয়। রেডিও আবিষ্কারে অবদান রেখেছেন, ইতালির মার্কনী ও বাংলাদেশের জগদীশ চন্দ্র বসু।

রেডিও এর সাহায্যে আমরা দূর-দূরান্ত হতে সম্প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের খবর, বিতর্ক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি শুনতে পাই। রেডিও হচ্ছে একমুখী গ্রাহক যন্ত্র। রেডিওতে শুধু শোনা যায় কিন্তু শোনার পরে কোন মন্তব্য বলে পাঠানো সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যদিও মোবাইল বা টেলিফোনে রেডিও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তারপরও মোবাইল বা টেলিফোন উভয়মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১৪.৪.১.২ রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা (Radio Communication System)

তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আবিষ্কার করলেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক। এই তরঙ্গের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্য স্থানে তার ছাড়া সংকেত পাঠানো সম্ভব হয়। এই কাজে অবদান রেখেছেন আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ইটালী বিজ্ঞানী মার্কনী। তাঁদের বদৌলতে আবিষ্কার হলো রেডিও। বেতার সম্প্রচার স্টেশনে কোনো ব্যক্তি যখন মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলেন তখন প্রথমে শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করা হয়। এই তরঙ্গের কম্পাংক কম বলে শক্তিও কম। এই তরঙ্গ বেশীদূর যেতে পারে না। সেজন্য অসিলেটরের সাহায্যে উচ্চ কম্পাংকের তরঙ্গ তৈরি করা হয়। এই তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ (carrier wave) বলে। এই বাহক তরঙ্গের উপর তড়িৎ তরঙ্গকে চাপিয়ে দেয়া হয়। একে বলে মডুলেশন।

এই মডুলেটেড তরঙ্গকে বিবর্ধন করে এন্টেনার মাধ্যমে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ আকারে মহাশূন্যে (space) সঞ্চালন করা হয় (চিত্র ১৪.১২ ক)। যেখানে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে বলে রেডিও স্টেশন বা বেতার কেন্দ্র। মহাশূন্যে প্রেরিত এই বেতার তরঙ্গের একটি অংশ সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রের এন্টেনায় পৌঁছায় এবং কিছু অংশ বায়ুমণ্ডলে উপরে অবস্থিত আয়নোস্ফেয়ারে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রের এন্টেনায় ফিরে আসে। যে তরঙ্গটি সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায় তাকে ভূমি তরঙ্গ (ground wave) এবং যে অংশ আয়নোস্ফেয়ারে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ফিরে আসে তাকে আকাশ তরঙ্গ (sky wave) বলে (চিত্র ১৪.১২ খ)। রেডিও হলো গ্রাহক যন্ত্র। রেডিও এন্টেনায় এই তরঙ্গ যখন পৌঁছায় তখন সেটি অত্যন্ত দুর্বল থাকে। রেডিওর মধ্যে একটি অসিলেটর থাকে যেটাকে আমরা টিউন করে মডুলেটেড তরঙ্গের সমান কম্পাংক তৈরি করি। দুই তরঙ্গ সমান হলে অনুনাদ হয় ফলে প্রাপ্ত তরঙ্গটি শক্তিশালী হয়। এই তরঙ্গকে ডিমডুলেশন করে বাহক তরঙ্গকে বাদ দেয়া হয়। এর ফলে শুধু মূল তড়িৎ তরঙ্গটি থেকে যায়। অবশিষ্ট মূল তড়িৎ তরঙ্গকে আবার বিবর্ধিত করে স্পিকারের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করা হয়। এর ফলে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সংবাদ আমরা শুনতে পাই (চিত্র ১৪.১২ গ)।

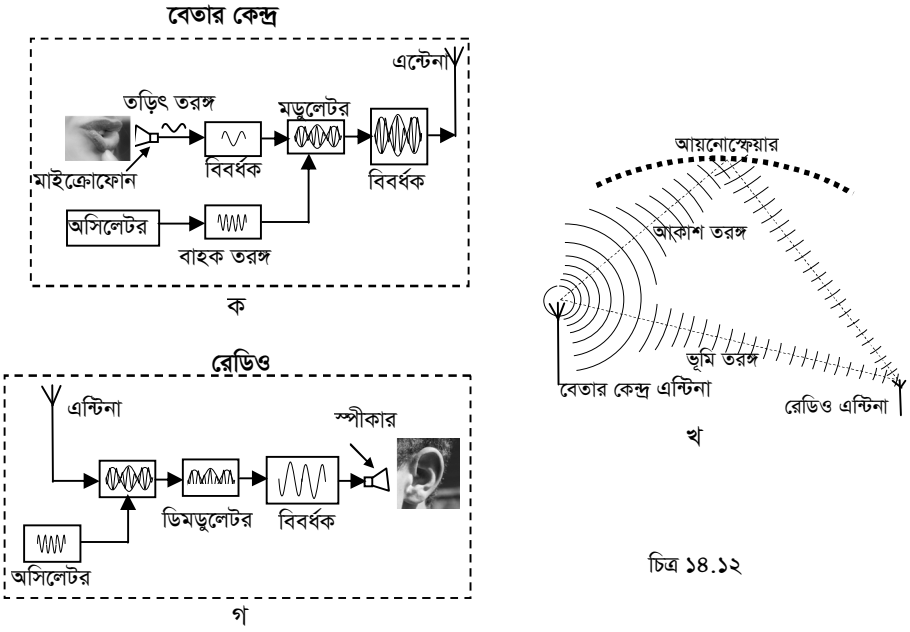

চিত্র ১৪.১২

রেডিওর মূল সমস্যা হলো এটি একটি একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সংবাদ ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকল লোক শুনতে পারে, কিন্তু কোনো শ্রোতা কোনো ভাবেই রেডিওর মাধ্যমে বেতার কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ করতে পারবে না। তবে বিনোদন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো রেডিও। রেডিও মাধ্যমে আমরা গান বাজনা, নাটক, খবর, আলোচনা, বিতর্ক, বিজ্ঞাপন, আবহাওয়ার সতর্কবাণী, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ ইত্যাদি শুনে থাকি। এছাড়াও সেনা বাহিনী দেশের মধ্যে দুর্যোগের সময় ও যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য আদান প্রদানের জন্য রেডিও ব্যবহার করে থাকে। পুলিশ বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে জনগনের নিরাপত্তার জন্য, সন্ত্রাস দমনের জন্য এমনকি অপরাধীকে ধরার জন্য নিজেদের মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগে রেডিও ব্যবহার করেন।

১৪.৪.২.১ টেলিভিশন (Television)

টেলিভিশন একটি জনপ্রিয় মাধ্যম যা তথ্য সম্প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি রেডিও এর মতো একমুখি যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে সংকেত পাঠানো হয় এবং ঐ সম্প্রচার কেন্দ্রের আওতাধীন সকলে টেলিভিশনের মাধ্যমে ঐ সম্প্রচারিত তথ্য, ছবি, মুভি বা লাইভ প্রোগ্রাম একই সাথে দেখতে এবং শুনতে পারে।

রেডিওর সাহায্যে আমরা প্রচারিত শব্দ শুনতে পাই। আর টেলিভশনে আমরা শব্দ শুনতে পাই এবং তার সাথে যিনি কথা বলছেন তাকেও দেখতে পাই। অথাৎ টেলিভিশনের সাহায্যে অডিও এবং ভিডিও উভয়ই আমরা পাই। ১৯২৬ সালে লজি বেয়ার্ড সর্বপ্রথম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চিত্র পাঠাতে সক্ষম হন। সেই চিত্রটি ছিল একটি পাপেট অর্থাৎ কথা বলা পুতুল।

১৪.৪.২.২ টেলিভিশনের কার্যকারীতা (Transmission of TV Wave)

চিত্র ১৪.১৩

আমরা আগেই বলেছি টেলিভিশনের সাহায্যে ছবি দেখতে পাই এবং কথা শুনতে পাই। সুতরাং টেলিভিশনে কথা এবং ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন কেন্দ্র দুটি প্রেরক যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত। একটির সাহায্যে শব্দকে তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ রূপে প্রেরণ করে এবং অন্য আর একটি প্রেরক যন্ত্রে ছবিকে তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ রূপে প্রেরণ করে। আমরা শব্দ তরঙ্গের প্রেরণ এবং গ্রহণ প্রক্রিয়া রেডিওতে আলোচনা করেছি এখানে আমরা ছবি কি করে প্রেরণ ও গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

টিভি ক্যামেরার পর্দায় উপর লাগানো আলোক সংবেদনশীল এক প্রকার পদার্থের আস্তরণ দেয়া থাকে। এর নাম সিজিয়াম। যখন বস্তু থেকে আলো এসে লেন্সের মধ্য দিয়ে পর্দায় প্রতিবিম্ব সৃষ্ট করে তখন পর্দার উপর লাগানো সিজিয়াম বিন্দু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে আধানযুক্ত হয়ে পড়ে। আলার তীব্রতার উপর আধানের পরিমাণ নির্ভর করে।অর্থাৎ যেখানে আলো বেশী পড়ে সেখানে আয়ন বেশী হয়। ফলে সমস্ত প্রতিবিম্বটি তড়িৎ প্রতিবিম্বে রূপান্তর হয়। এখন একটি ইলেকট্রনগান এই আধানগুলোকে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তর করে। ইলেকট্রনগান সমস্ত চিত্রটিকে 625টি লাইনে ভাগ করে বই পড়ার মত করে বাম থেকে ডান দিকে লাইন বরাবর সরতে থাকে এবং এক লাইন পড়া শেষ হলে দ্রুত পরে লাইনের প্রথমে চলে আসে। তবে প্রথমে সমস্ত চিত্রটিকে এক লাইন বাদ দিয়ে দিয়ে ৩১২.৫ লাইনে এক বার পড়ে দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে অবশিষ্ট ৩১২.৫ লাইন পড়ে ফাঁকা স্থানগুলো পূরণ করে। একে স্ক্যানিং বলে। চিত্রে ১৪.১৩ তে স্ক্যানিং দেখানো হলো। একবার স্ক্যানিং হলে চিত্রে একটা ফ্রেম তেরি হয়। প্রতি সেকেন্ডে এইরূপ ২৫টি ফ্রেম তৈরি করে। এই স্ক্যানিং করা চিত্রের রূপান্তরিত তড়িৎ প্রবাহকে বিবর্ধন করে উচ্চ কম্পাংকের বাহক তরঙ্গে চাপিয়ে মডুলেশন করে প্রেরক এন্টিনার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এখানে মনে রাখতে হবে, শব্দ তরঙ্গকে ছবি তরঙ্গ থেকে আলাদা করার জন্য ছবির তড়িৎ তরঙ্গের জন্য ব্যবহৃত বাহক তরঙ্গের কম্পাংকের চেয়ে শব্দ তরঙ্গের জন্য বাহক তরঙ্গের কম্পাংক 5.5MHz বেশী থাকে। চিত্র ১৪.১৪ক-তে পিকচার সিগন্যাল দেখানো হয়েছে। চিত্র ১৪.১৪ক-তে ভিডিও সিগন্যালের দেখানো হলো। মূলত টিভি প্রচার কেন্দ্র থেকে এই সিগন্যালই ট্রান্সমিট করা হয়। চিত্র ১৪.১৪ক-তে দুই পিকচার সিগন্যালের মাঝে অংশটি মূলতঃ প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্রেও মাঝে সিন্‌ক্রোনাইজ করে থাকে। নীচে ভিডিও সিগন্যালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

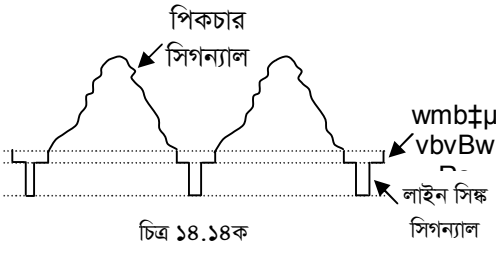

চিত্র ১৪.১৪ক

সিন্‌ক্রোনাইজিং ঃ আমরা জেনেছি যে, কোনো ছবি ট্রান্সমিট করা হয় একের পর এক লাইন ধরে এবং গ্রাহক যন্ত্রেও পর্যায়ক্রমে সেই একই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লাইন পুনরুৎপাদিত হয়। সঠিকভাবে ছবি পুনরুৎপাদনের জন্য টেলিভিশন ক্যামেরাতে ঘটানাগুলো ঠিক যে সময় যে রকম ভাবে ধরে রাখা হয়, রিসিভারেও ঠিক ঐ একই রকম ভাবে প্রত্যেক লাইন স্ক্যানিং হওয়া প্রয়োজন। ঠিক একই রকম ভাবে টিভি ক্যামেরায় ঘটনা সকল ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ফ্রেমের স্ক্যানিং শুরু হওয়া চাই। যে পদ্ধতিকে টিভি গ্রাহক যন্ত্রে লাইন ও ফ্রেম সুইপের আরম্ভ হওয়ার ঘটনা এবং টিভি ক্যামেরায় একই ঘটনা একই সময় একই পদ্ধতিতে ধরে রাখা হয় তাকে বলা হয় "সিন্‌ক্রোনাইজিং"। সিন্‌ক্রোনাইজ করার জন্য সিন্‌ক্রোনাইজিং সিগন্যালের সাহায্য নেয়া হয়। এই সিগন্যাল পাওয়া যায় ট্রান্সমিটার থেকে। লাইন এবং ফ্রেম সুইপ করার জন্য দুটি ভিন্ন সিন্‌ক্রোনাইজিং সিগন্যাল অর্থাৎ সিঙ্ক সিগন্যাল প্রয়োজন। এই সিগন্যাল হচ্ছে আয়তকার পাল্‌স। লাইন সিন্‌ক্রোনাইজ করার জন্য প্রত্যেক লাইনের পর একটি করে পাল্‌স ট্রান্সমিট করা হয়। একে লাইন সিন্‌ক্রোনাইজিং সিগন্যাল বলে। আবার ফ্রেম সিন্‌ক্রোনাইজ করার জন্য প্রত্যেক ফ্রেমের অর্থাৎ প্রত্যেক ফিল্ডের পর পাঁচটি করে পাল্‌স ট্রান্সমিট করা হয়। একে ফ্রেম সিন্‌ক্রোনাইজিং সিগন্যাল বলে।

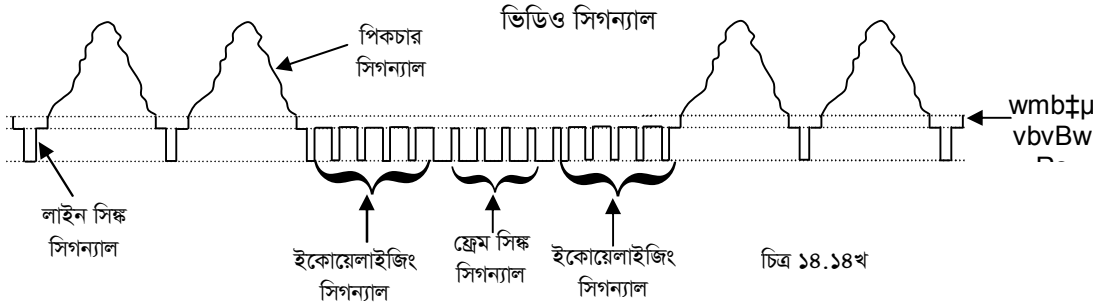

চিত্র ১৪.১৪খ

গ্রাহক যন্ত্রে লাইন ও ফ্রেম সিঙ্ক সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য বোঝাবার জন্য এদের স্থিতিকাল আলাদা রাখা হয়। লাইন সিঙ্ক পাল্‌সের স্থিতিকাল প্রায় 5.8μs এবং ফ্রেম সিঙ্ক পাল্‌সের স্থিতিকাল প্রায় 26μs । ফ্রেম সিন্‌ক্রোনাইজিং সিগন্যালের আগে ও পরে সমতাবিধানকারী সিগন্যাল অর্থাৎ ইকোয়েলাইজিং (equalising) সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয়। এই পাল্‌সের স্থিতি কাল লাইন সিঙ্ক পাল্‌সের অর্ধেক।

ব্ল্যাঙ্কিং ঃ আমরা জেনেছে যে, লাইন স্ক্যানিং সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই ইলেকট্রন বীম ফিরে যায় পরের লাইন স্ক্যানিং করার জন্য। বীমের এই ফিরে যাওয়াকে বলে "রিট্রেস"। এই রিট্রেস লাইন যেন ফুটে না উঠে বা দেখা না যায় তার জন্য ইলেকট্রন বীমকে সংঘত (suppress) করা দরকার। আর এই জন্য ব্লাঙ্কিং পাল্সের প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রন বীমকে সংঘত করার জন্য ব্ল্যাঙ্কিং সিগন্যালও ট্রান্সমিট করা হয়। ব্ল্যাঙ্কিং পাল্স এক প্রকার আয়তকার পাল্স এবং প্রত্যেক লাইনের শেষে এদের ট্রানসমিট করা হয়।

এই ভাবে পিকচ্যার সিগন্যাল, লাইন সিন্ক্রোনাইজিং সিগন্যাল, ফ্রেম সিন্ক্রোনাইজিং সিগন্যাল, ব্ল্যাঙ্কিং সিগন্যাল এবং ইকোয়েলাইজিং সিগন্যাল সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিডিও সিগন্যাল গঠিত হয়।

১৪.৪.২.৩ টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি গ্রহণ (Recevesion of Sound and Picture in TV)

টিভি সেটের পিকচার টিউবে সামনের অংশে ভিতর পিঠে ফসফর নামক এক প্রকার প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে। এই প্রতিপ্রভ পদার্থে কোনো বিন্দুতে ইলেকট্রন এসে পড়লে ঐ বিন্দুটি আলো বিকিরণ করে। সকল টিভি কেন্দ্র থেকে এন্টেনার সাহায্যে প্রেরিত ছবির জন্য তাড়িতচৌম্বকীয় বাহক তরঙ্গ টিভি এন্টেনা গ্রহণ করে। টিউন করে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রের বাহক তরঙ্গকে নির্বাচন করে তাকে ডিমডুলেশন করে প্রকৃত ছবির তড়িৎ তরঙ্গকে আলাদা করে নিয়ে বিবর্ধন করা হয়। এই বিবর্ধিত তরঙ্গকে ইলেকট্রনগানে পাঠানো হয়। এই ইলেকট্রনগান টিভি সেটের পিকচার টিউবের পশ্চাৎ ভাগে থাকে। পিকচার টিউবে সামনের অংশে ভিতর পিঠে ফসফর নামক এক প্রকার প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে। এই প্রতিপ্রভ পদার্থে কোনো বিন্দুতে ইলেকট্রন এসে পড়লে ঐ বিন্দুটি আলো বিকিরণ করে। যখন কোনো সংকেত ইলেকট্রনগানে থাকে না তখন ইলেকট্রনগান থেকে একটি সরু ইলেকট্রন বীম টিভির পর্দার উপর ঠিক টিভি ক্যমেরার মত প্রতি সেকেন্ডে ২৫ বার পর্দাকে ৬২৫টি লাইনে ভাগ করে বই পড়ার মত করে বাম থেকে ডান দিকে লাইন বরাবর সরতে থাকে এবং এক লাইন পড়া শেষ হলে দ্রুত পরের লাইনের প্রথমে চলে আসে। তবে প্রথমে সমস্ত চিত্রটিকে এক লাইন বাদ দিয়ে দিয়ে ৩১২.৫ লাইনে এক বার পড়ে দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে অবশিষ্ট ৩১২.৫ লাইন পড়ে ফাঁকা স্থানগুলো পূরণ করে। ফলে আমরা সমস্ত টিভিতে সাদা একটা পর্দা দেখি। এখন ইলেকট্রনগানে তড়িৎ সংকেত আসলে সংকেতের তীব্রতা অনুসারে ইলেকট্রনগান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে পর্দার উপর প্রলেপ দেয়া ফসফরের উপর পড়ে আলো বিকিরণ করে। যেখানে সংকেতের তীব্রতা বেশী থাকে সেখানে আলো বেশী বিকিরণ করে এবং যেখানে কোনো তড়িৎ সংকেত থাকে না সেখানে আলো বিকরিত হয় না। ফলে সেখানে অন্ধকার দেখায়। টিভি ক্যামেরার সামনে অবস্থিত ব্যক্তির প্রতিবিম্বের পাঠানো তড়িৎ তরঙ্গ এই ভাবে আলো আধাঁরের সাদা কালো চিত্র তৈরি হয় এবং আমরা সেটি টিভির পর্দায় দেখতে পাই। যেহেতু শব্দ বাহক তরঙ্গের কম্পাংক ছবির বাহক তরঙ্গের চেয়ে 5.5MHz বেশী রেখে আলাদা করা হয় ফলে আলাদা একটি টিউনার দিয়ে একে শক্তিশালী করে ডিমডুলেটর দিয়ে আলাদা করে ভিন্ন একটি বিবর্ধকের মাধ্যমে এই তরঙ্গকে বিবর্ধিত করে স্পীকারের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করা হয় এবং আমরা তা শুনতে পাই।

১৪.৪.৩ টেলিফোন (Telephone)

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) ১৮৭৫ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। অনেক উন্নতি সাধনের পর টেলিফোন বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠেছে। টেলিফোন এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি যোগাযোগ মাধ্যম তবে এটি অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের তুলনায় ব্যয়বহুল। বর্তমানে টেলিফোনের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো দেশে লোকের সাথে কথাবার্তা আদান প্রদান করা সম্ভব। মূলতঃ টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরকের শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে তারের মাধ্যমে সংবাদ প্রাপকের নিকট পৌছিয়ে তড়িৎ তরঙ্গকে পুনরায় শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করে সংবাদ প্রেরক ও প্রাপকের মাঝে সরাসরি কথা বিনিময় করা হয়।

১৪.৪.৩.১ টেলিফোনের মূলনীতি (Working Principle of Telephone)

টেলিফোনে দুইটি তড়িৎ যন্ত্র থাকে। একটি হলো মাইক্রোফোন এবং অপরটি হলো ইয়ারফোন বা স্পিকার। মাইক্রোফোনের কাজ হলো শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করা এবং ইয়ারফোন বা স্পিকার তড়িৎ তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করে। যে যন্ত্র কোন অতড়িৎ সংকেতকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে অথবা তড়িৎ সংকেতকে অতড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে তাকে ট্রান্সডিউসার বলে। সুতরাং মাইক্রোফোন ও ইয়ারফোন বা স্পিকার উভয়ই এক ধরণের ট্রান্সডিউসার। এখন যিনি কথা বলবেন তাঁর মাইক্রোফেনের সাথে যিনি কথা শুনবেন তাঁর স্পিকারের সাথে তার দিয়ে যুক্ত করা হয় তবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। এটাই হলো টেলিফোনের মূলনীতি। যে যন্ত্র দিয়ে টেলিফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সংঘটিত হয় সেই যন্ত্র দুটির গঠন জেনে নেয়া উচিৎ। নীচে তার বর্ণনা দেয়া হলো।

১৪.৪.৩.২ মাইক্রোফোন (Microphone)

মাইক্রোফোন এমন এক ধরনের ট্রান্সডিউসার যা শব্দশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। যেমন- কোন অনুষ্ঠানে বক্তা মাইক্রোফোনে কথা বলেন। মোবাইল বা টেলিফোন এর মুখের সম্মুখের অংশে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়, গান রেকর্ড করার জন্য মাইক্রোফোনের ব্যবহার করা হয়।

১৪.৪.৩.৩ মাইক্রোফোনের কার্যক্রম (Function of Microphone)

মাইক্রোফোন ডায়াফ্রাম(ধাতুর তৈরী নমনশীল পাত) ও চলকুন্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। মাইক্রোফোনের সামনে যখন শব্দ করা হয় তখন শব্দ তরঙ্গের প্রভাবে ডায়াফ্রামটি কম্পিত হয়। ডায়াফ্রাম যখন কম্পিত হয় তখন চলকুন্ডলীতে চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন হয় এবং আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় যা তড়িৎ তরঙ্গে পরিণত হয়। এভাবেই মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

চিত্র ১৪.১৫

১৪.৪.৩.৪ স্পীকার (Speaker)

স্পীকার এমন এক ধরনের ট্রান্সডিউসার যা তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যেমন মোবাইল বা টেলিফোনে কানের কাছে, রেডিও-টেলিভিশনে স্পীকার ব্যবহার করা হয় জোরালো শব্দ শোনার জন্য।

১৪.৪.৩.৫ স্পীকারের কার্যক্রম (Function of Speaker)

স্পীকার মাইক্রোফোনের ঠিক উল্টো কাজ করে। একটি স্থায়ী চুম্বক যা শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরী করতে পারে। চুম্বকের উপরে চুম্বক স্পর্শ না করে কুন্ডলী পেঁচানো থাকে। তারের মাধ্যমে কুন্ডলীটিতে তড়িৎ তরঙ্গ আসলে তরঙ্গের মানের উপর ভিত্তি করে কুন্ডলীটি সম্মুখে-পশ্চাতে উঠা-নামা করে। কুন্ডলীর সাথে একটি শংকু আকৃতির (চিত্র ১৪.১৫) কাগজ লাগানো থাকে যা কুন্ডলীর সাথে যুক্ত থাকে, ফলে কুন্ডলীর কম্পনকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করে।

চিত্র ১৪.১৫

১৪.৪.৪ মোবাইল ফোন (Mobile Phone)

মোবাইল ফোন বা সেলফোন বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম। এটি প্রকৃত পক্ষে একটি ট্রান্সমিটার ও রিসিভার অর্থাৎ একে এক কথায় ট্রান্সসিভার বলে। প্রথম দিকে এটি শুধু যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এটি বিনোদন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহার পর্যন্ত সকল কাজেই ব্যবহার করা যায়। মোবাইল ফোন এখন একটি ছোটো খাটো কম্পিউটারের ন্যায় কাজ করে। এর সাহায্যে গেইম খেলা, গানশুনা, গান ডাইনলোড করা, সিনেমা দেখা, ভিডিও কনফারেন্স করা, ইন্টারনেট ব্যবহার করা, চিঠি-পত্র আদান প্রদান করা, স্থির ও ভিডিও চিত্র গ্রহন ও প্রেরণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা যায়। তাছাড়াও মোবাইল ফোন দিয়ে ক্যাশ পেমেন্ট, বিল পরিশোধ, এয়ারপোর্টে চেক-ইন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির দরখাস্ত করা যায়।

১৪.৪.৪.১ মোবাইল ফোনে কল করা ও কল রিসিভ করা (Calling and Receiving System of Mobile)

মোবাইল ফোন একটি চলমান যন্ত্র অর্থাৎ যিনি কল করেন তিনি কোনো এক জায়গায় স্থির থেকে কথা বলেন না এবং যিনি কল রিসিভ করেন তিনিও স্থির থাকেন না। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার চারিপার্শ্বে বহু টাওয়ার আছে। একে বলে BTS (Base Tower Station)। এইরূপ বেশ কিছু BTS একটি BSC (Base Station Centre) এর সাথে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। অনেকগুলো BSC আবার একটি MSC (Mobile switching Centre) এর সাথে যুক্ত। সকল MSC পরস্পরের সাথে অপটিক্যাল ফাইবারের (Optical Fibre) মাধ্যমে যুক্ত থাকে। চিত্র ১৪.১৬-তে মোবাইল নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে। চিত্র ১৪.১৬ক-তে দুটি বিশেষ মোবাইল ফোনের সাথে যোগাযেগের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা দেখানো হলো।

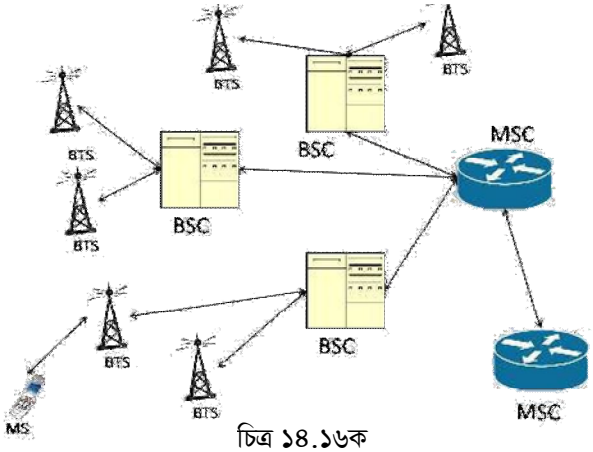

চিত্র ১৪.১৬ক

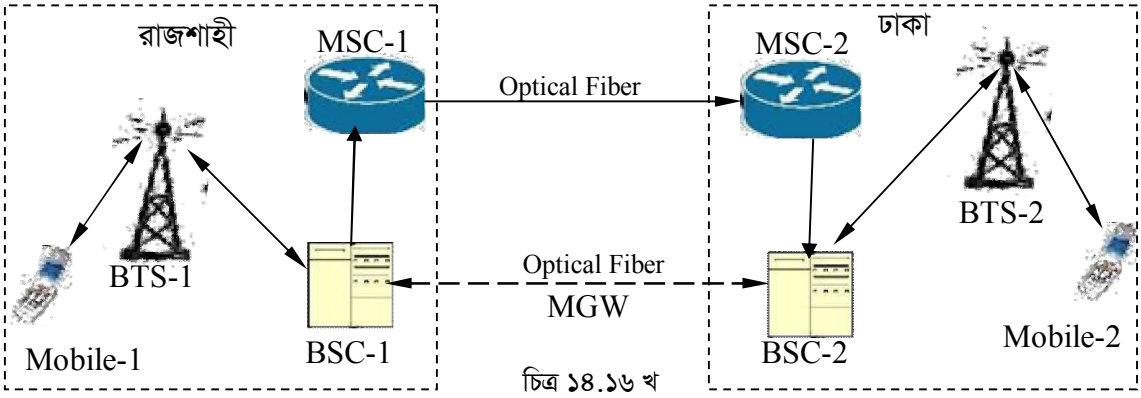

চিত্র ১৪.১৬ খ

ধরুন আপনি রাজশাহীতে আছেন এবং আপনার বন্ধু ঢাকায় অবস্থান করছেন। বিশেষ প্রয়োজনে আপনি তার সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলতে চান। যখন আপনি তার নম্বরে কল করেন তখন আপনি আসলে একটি বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করেন। আপনার মোবাইল সে সময় যে BTS-1 এর অধীনে আছে। আপনার সংকেত BTS-1 গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত BSC -1 এর কাছে সংকেত পাঠায়। সেই সংকেতে কোন নম্বর থেকে কল হয়েছে এবং কোন নম্বর তা রিসিভ করবে তার সংকেত থাকে। BSC-1 তখন আপনার জন্য একটি MGW (Media Get Way) এর প্রয়োজনে একটি অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fibre) নির্ধারণ করে এবং MSC-1 এর কাছে সংকেত পাঠায় এবং MGW চাওয়া হয়। তখন MSC-1

খোঁজ করে আপনার কাঙ্খিত নম্বরের মোবাইলটি বর্তমানে কোন MSC এর আওতাভূক্ত আছে তা যাচাই করার পর আপনার MSC-1 কাঙ্খিত নম্বরটি যে MSC-2 এর আওতাভূক্ত আছে তার কাছে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে সংকেত পাঠায়। তখন MSC-2 কল রিসিভার যে BSC আওতাধীনে আপনার মোবাইল ফোনটি আছে তার কাছে সংকেত পাঠায় অর্থাৎ BSC-2 এর কাছে সংকেত পাঠায়। BSC-2 সংকেত পাঠায় BTS-2 এর কাছে এই বলে যে, তার অধীনে থাকা কল রিসিভারটি চালু আছে কিনা। যদি কল রিসিভারে চালু থাকে তবে BTS-2 আবার BSC-2 কে সংকেত পাঠায় সংযোগ দেবার জন্য। BSC-2 তখন BSC-1 এর পূর্বে MGW-এর প্রয়োজনে যে অপটিক্যাল ফাইবারটি নির্ধারণ করে রেখেছিল তার সঙ্গে সংযোগ করে দেয়। সংযোগ হয়ে গেলে আপনার কথা বেতার তরঙ্গ আকারে BTS-1 গ্রহণ করে BSC-1 এ পাঠায়। BSC-1 তখন MGW মাধ্যমে BSC-2 তে এবং BSC-2 থেকে BTS-2 হয়ে কল আপনার বন্ধুর মোবাইল ফোনে পৌঁছায়। অনুরূপ ভাবে বিপরীত ক্রমে যিনি কলটি রিসিভ করেছিলেন তার কথাও আপনার কাছে পৌঁছায়। আপনার চলমান থাকার কারণে আপনি যদি কোনো কারণে যে BTS এর অধীনে ছিলেন সেখান থেকে সরে যান তবে তৎক্ষণাৎ আপনি যে BTS অধীনে চলে গেছেন তার সাথে আপনার যোগাযোগ হয়ে যাবে। ফলে আপনার কলটি অর্থাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না (চিত্র ১৪.১৬)।

১৪.৪.৫ ফ্যাক্স (Fax)

বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার বেইন ১৮৪২ সালে ফ্যাক্স মেশিন আবিস্কার করেন। ফ্যাক্সের পুরো নাম হলো ফ্যাক্সিমিল। কোনো ডকুমেন্টকে হুবহু কপি করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপকের কাছে পাঠাতে ফ্যাক্স ব্যবহার করা হয়। প্রেরক যে ডকুমেন্ট যেমন দলিল, সার্টিফিকেট, ছবি, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি প্রাপকের কাছে পাঠাতে চান সে ডকুমেন্ট তার ফ্যাক্স মেশিনের সাহায্যে হুবহু কপি তৎক্ষণাৎ প্রাপকের ফ্যাক্স মেশিনে পাঠাতে পারেন এবং প্রাপক তার মেশিন থেকে সেই ডকুমেন্টের প্রিন্ট কপি পেয়ে যান।

১৪.৪.৫.১ ফ্যাক্সের মূলনীতি (Principle of Fax)

ফ্যাক্স মেশিন হলো মূলতঃ টেলিফোন, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও মোডেম সম্মিলিত একটি যন্ত্র। প্রেরক কোনো ডকুমেন্ট পাঠাতে চাইলে তিনি প্রথমে টোলফোনে ডায়াল করে প্রাপকের ফ্যাক্স মেশিনের সাথে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করেন। তারপর তাঁর ডকুমেন্টটি ফ্যাক্স মেশিনে রাখলে ডকুমেন্টের যাবতীয় লেখা বা ছবি স্ক্যানারের মাধ্যমে ডিজিটাল ছবিতে রূপান্তর হয়। সেই ছবি মোডেমের সাহায্যে এনালগ সংকেতে রূপান্তর করে টেলিফোন লাইনের সাহায্যে প্রাপকের মোডেমে পাঠায়। প্রাপকের মোডেম সেই এনালগ সংকেতকে পুনরায় ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে ফ্যাক্স মেশিনের প্রিন্টারে পাঠায় এবং প্রিন্টারে সাহায্যে প্রেরকের পাঠানো ডকুমেন্টের হুবহু কপি প্রাপক পেয়ে যান।

সার-সংক্ষেপঃ

মাইক্রোফোন ঃ মাইক্রোফোন এমন এক ধরনের ট্রান্সডিউসার যা শব্দশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে।

স্পীকার ঃ স্পীকার এমন এক ধরনের ট্রান্সডিউসার যা তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

মোবাইল ফোন ঃ মোবাইল ফোন বা সেলফোন প্রকৃতপক্ষে একটি ট্রান্সমিটার ও রিসিভার অর্থাৎ একে এক কথায় ট্রান্সসিভার বলে। এটি দ্বিমুখি যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এটি বিনোদন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহার পর্যন্ত সকল কাজেই ব্যবহার করা যায়।

ফ্যাক্স ঃ ফ্যাক্সের পুরো নাম হলো ফ্যাক্সিমিল। কোনো ডকুমেন্টকে হুবহু কপি করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপকের কাছে পাঠাতে ফ্যাক্স ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নীচে কোনটি উভমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা **নয়?**

ক. টেলিভিশন খ. টেলিফোন গ. মোবাইল ঘ. ফ্যাক্স

২. ট্রান্সডিউসারের কাজ হলো

i. তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তর করা

ii. শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা

iii. তড়িৎ শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা

নীচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. ফ্যাক্সের সাহায্যে কী করা যায়?

ক. তথ্য আদান প্রদান খ. কথাবার্তা আদান প্রদান

গ. মেইল আদান প্রদান ঘ. ডকুমেন্ট আদান প্রদান

পাঠ ৫ ঃ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট (Computer and Internet)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

১.কম্পিউটারের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

২.ইন্টারনেট ও ই-মেইলের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ডিভাইসসমূহ কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে এবং এদের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করতে পারবেন।

১৫.৫.১ কম্পিউটার (Computer)

তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার একটি অপরিহার্য যন্ত্র। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল কাজেই কম্পিউটার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। জীবনের যে সব ক্ষেত্রে গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজকর্মের সম্পর্ক রয়েছে তার সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আছে। ব্যক্তিগত জীবনের হিসাব নিকাশ, বিল পরিশোধ, ব্যাংকিং বা বিনোদনের দায়িত্ব যেমন কম্পিউটারকে দেয়া যায়, তেমনি কোনো অফিসের যাবতীয় লেনদেন, চিঠিপত্রের যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদির সকল দায়িত্ব দেয়া যায়। কলকারখানার উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্যের হিসাব, আয় ব্যয় এমন কি কর্মচারীর বেতন, লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশও এখন মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। কম্পিউটার মানুষের যেমন দৈহিক শ্রম কমিয়েছে তেমনি সময়ও বাঁচিয়েছে। বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যবহার এত বেশী যে এই যুগকে কম্পিউটার যুগও বলা হয়। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে কম্পিউটার ছাড়া মানুষ এখন অচল। কম্পিউটারের স্মৃতি ভান্ডারে এত জ্ঞান বা তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় যা কল্পনা করা যায় না।

১৫.৫.১.২ কম্পিউটার কী (What is Computer)

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ল্যাটিন শব্দ Computare শব্দ থেকে ইংরেজি কম্পিউটার (Computer) শব্দটির

উৎপত্তি। কম্পিউটার শব্দটির আভিধানিক অর্থ গণনা যন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র। কম্পিউটার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি গাণিতিক কার্যাবলী এবং সাথে সাথে যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্দেশনা মতো কম্পিউটার গাণিতিক ও যৌক্তিক প্রণালী সমাধা করে এবং ফলাফল প্রদান করে। কম্পিউটারের নিজ থেকে কিছুই করার ক্ষমতা নেই। ব্যবহারকারী কম্পিউটারকে যে ভাবে নির্দেশনা দান করে তার উপর ভিত্তি করেই কম্পিউটার কাজ করে। কম্পিউটারকে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা, তথ্য ও ফলাফল তার স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজন বোধে তা পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হলো যে, যন্ত্রটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ভুলভাবে এবং ক্লান্তিহীনভাবে অবিরাম কাজ করতে পারে। কম্পিউটার নিজে কোনো ভুল করে না। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর প্রদত্ত নির্দেশনা বা উপাত্তে ভুল না থাকলে কম্পিউটার কখনোই ভুল ফলাফল প্রদান করে না।

১৫.৫.১.৩ কম্পিউটারের সংগঠন (Organization of Computer)

প্রোগ্রামের কোনো ভৌত অবকাঠামো নেই বলে কম্পিউটারে সংগঠন বলতে কেবল মাত্র হার্ডওয়্যারের সংগঠনকে বুঝানো হয়। কম্পিউটারের সংগঠন কে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়।
যথা ঃ
(ক) কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit)
(খ) ইনপুট বা গ্রহণমুখ ইউনিট (Input Unit)
(গ) আউটপুট নির্গমনমুখ ইউনিট (Output Unit)

চিত্র ১৪.১৭ এর সাহায্যে কম্পিউটারের সংগঠনকে দেখানো হলো ঃ

(ক) **কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (CPU) ঃ**
সিপিইউ কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কম্পিউটারের মস্তিষ্কের মত। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, গাণিতিক ইউনিট ও স্মৃতি ইউনিট এই তিনটি অংশকে একত্রে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বলা হয়।

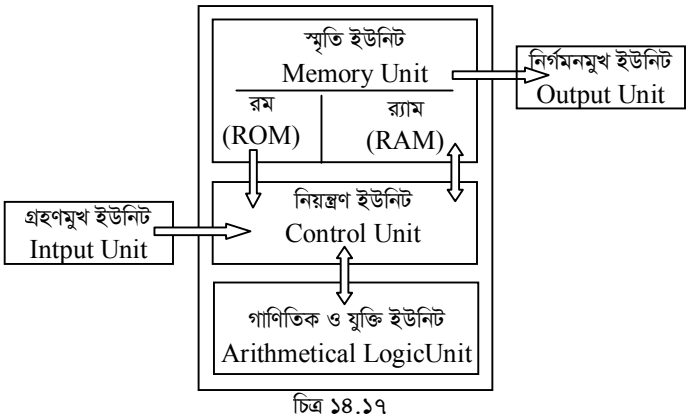

চিত্র ১৪.১৭

১। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) ঃ
গ্রহণমুখ ইউনিট (Input unit) থেকে আগত তথ্য ও নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ অংশ গ্রহণ করে এবং কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশনা পরীক্ষা করে। নির্দেশনা গুলোকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। কখন স্মৃতি থেকে তথ্য নিতে হবে, কখন স্মৃতিতে তথ্য প্রেরণ করতে হবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করে। উপাত্ত প্রক্রিয়া করণের জন্য গাণিতিক ইউনিটে তথ্য প্রেরণ এবং সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাত ফলাফল গ্রহণ করে স্মৃতিতে পাঠানো, কাজ সম্পন্ন করার পর আউটপুটের মাধ্যমে বের করে দেয়ার কাজও নিয়ন্ত্রণ ইউনিট করে থাকে।

২। গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিট (Arithmetical LogicUnit) ঃ
গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিট কম্পিউটারের অন্যতম প্রধান অংশ। এ অংশকে সংক্ষেপে এ.এল.ইউ. (ALU) বলে। বিভিন্ন প্রকার লজিক বর্তনীর সমন্বয়ে এ অংশটি গঠিত। এ অংশে তথ্যের উপর যাবতীয় গণনার কাজ যেমনঃ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি সম্পন্ন করে, তাছাড়াও যুক্তি সম্পর্কিত যেমনঃ 'হ্যাঁ' বা 'না' কাজগুলোও সম্পন্ন করে। কাজ শেষে ফলাফলগুলো প্রধান স্মৃতিতে জমা হয় এবং আউটপুটে পাঠানো হয়।

৩। স্মৃতি ইউনিট (Memory Unit) ঃ
স্মৃতি হলো কম্পিউটারের একটি অংশ যেখানে তথ্য জমা থাকে। কম্পিউটারের কাজ চলাকালীন প্রয়োজনীয় তথ্য স্মৃতিতে

জমা করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে এখান থেকে তথ্য নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। যে কোনো তথ্য দিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে হলে প্রথমে তা স্মৃতিতে জমা রাখতে হয়। স্মৃতি ইউনিটে আছে রম (ROM) এবং র‍্যাম (RAM)। রম (ROM) স্মৃতি থেকে রক্ষিত তথ্য নিয়ে (read) প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা যায় কিন্তু কোনো তথ্য এখানে রাখা (write) যায় না। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এর মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় করে রাখেন যা ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারে না। রম (ROM) এর পূর্ণ নাম হলো Read Only Memory। র‍্যাম (RAM) এর পূর্ণ নাম হলো Random Access Memory। কম্পিউটার এই স্মৃতিতেই মূলতঃ গ্রহণমুখ ইউনিট থেকে আগত তথ্য ও নির্দেশনা, গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিট থেকে প্রক্রিয়াজাত ফলাফল এবং তার প্রয়োজনীয় তথ্য জমা রাখে।

(খ) ইনপুট ইউনিট ঃ

যে অংশে কম্পিউটারে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশনা দেয়া হয় সে অংশকে বলা হয় ইনপুট ইউনিট। অর্থাৎ যে যন্ত্র বা ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য বা নির্দেশনা প্রদান করা হয় সেগুলোকে বলে ইনপুট ইউনিট। বিভিন্ন ধরণের ইনপুট ইউনিটের মধ্যে কী-বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, কার্ড-রীডার, পেপার টেপ রীডার, ম্যাগনেটিক টেপ ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ, সিডি ও ডিভিডি ড্রাইভ ইত্যাদি অতি পরিচিত ইনপুট ইউনিট।

(গ) আউটপুট ইউনিট ঃ

কম্পিউটারে প্রদত্ত তথ্যাবলী সিপিইউতে প্রক্রিয়াকরণের পরে যে সকল যন্ত্র বা ডিভাইস দিয়ে ফলাফল প্রকাশ করে সেগুলোই হলো আউটপুট ইউনিট। মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ, শব্দ সংশ্লেষক ইত্যাদির নাম আউটপুট ডিভাইস হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

১৪.৫.২.১ কম্পিউটারের ব্যবহার (Uses of Computer)

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে কোনো প্রকার কাজেই কম্পিউটারের উপস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। কার্য সম্পাদনে দ্রুততা, নির্ভুলতা, তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কারণে কম্পিউটারের প্রয়োগ ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। নীচে কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক জীবনে ঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগত বা সামাজিক যেকোনো কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমানে অনেকেই পারিবারিক হিসাব-নিকাশ, চিঠিপত্র লেখা, কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করা, গান শোনা, ছবি দেখা, বিদেশে আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করা এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা উপকরণ হিসাবে বাড়িতে কম্পিউটার ব্যবহার করেন।

শিক্ষা ঃ বর্তমানে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকগণ কম্পিউটারের সাহায্যে পাঠদান করেন। প্রশ্নপত্র প্রনয়ণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ, ফলাফল প্রকাশ, ছাত্র/ছাত্রীর মেধাতালিকা, ছাত্র/ছাত্রীদের সকল নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ইত্যাদিতে কম্পিউটারের ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকাল ঘরে বসেই অনলাইনে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

গবেষণা ঃ গবেষণার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার ছাড়া মহাকাশ গবেষণার কথা ভাবাই যায় না। কম্পিউটার ছাড়া মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে কম্পিউটারের সংযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায় যা অন্য উপায়ে অসম্ভব। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কম্পিউটারের অবদান অপরিসীম। পদার্থের পারমাণবিক গঠন বিশ্লেষণ, জীনের গাঠনিক রূপ, মহাকাশে নভোযান প্রেরণ ইত্যাদি সবই কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রোগ নির্ণয়ে আজকাল ডাক্তারেরা কম্পিউটারের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত যন্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কম্পিউটারের বদৌলতে অন-লাইন থেকেও অনেকে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করেন। নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে বিশ্বের স্বনামধন্য চিকিৎসকের সরাসরি পরামর্শে জটিল রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কম্পিউটারের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ধরণের লেনদেন, সংরক্ষণ, হিসাব নিকাশ সম্পাদন, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অনায়াসে কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ যাতায়াত ব্যবস্থায় কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিমান, জাহাজ, ট্রেন, বাস ইত্যাদি যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক কন্ট্রোল, টিকেট বুকিং ইত্যাদি এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। মহাকাশে নভোযান প্রেরণ, অবতরণ, সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি কম্পিউটার ছাড়া অসম্ভব।

শিল্প কারখানা ঃ শিল্প কারখানায় দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতির নকশা, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কম্পিউটার যথেষ্ট সাফল্য দিয়েছে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক কারখানা, ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন যন্ত্রের চাপ, তাপমাত্রা, পরিমাণ ইত্যাদি সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন হয়। কম্পিউটার এই সব কাজগুলো সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রতিরক্ষা ঃ কম্পিউটার দ্রুত গতিতে নির্ভুলভাবে এবং ক্লান্তিহীনভাবে অবিরাম কাজ করে বলে বর্তমাস বিশ্বে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপরিহার্য হয়ে পরেছে। দেশের অভ্যন্তরে অপরাধী সনাক্তকরণ, অপরাধী অনুসরণের জন্য পরস্পরের সাথে যোগাযোগ, অপরাধীর তথ্য সংরক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। সেনাবাহিনী পরিচালনা, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাদের সাথে যোগাযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, এমনকি ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপের স্থান নির্ধারণও কম্পিউটারের সাহায্যে করা হয়।

মুদ্রণ ঃ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে প্রকাশনা শিল্পে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে। আগে যেমন শত শত শ্রমিককে দিন রাত পরিশ্রম করে সংবাদ পত্রের অক্ষর বিন্যাস করতে হতো এখন কয়েকজন কর্মী অনায়াসে কম্পিউটারের সাহায্যে তা সম্পাদন করতে পারেন। তাছাড়া কম্পিউটারে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের অক্ষর ব্যবহারের সুবিধা, বিভিন্ন ধরণের গ্রাফিক্স সম্পাদনা ও বিভিন্ন রঙের চিত্র প্রয়োগ করার সুবিধা। ফলে রঙ্গিন পত্র-পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

১৫.৫.২ ইন্টারনেট ও ই-মেইল (Internet and Email)

১৪.৫.২.১ ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হলো একধরণের নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যার সাহায্যে বিশ্বের সকল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। অসংখ্য কম্পউটারে, মোডেম, টেলিফোন লাইন, ওয়ারলেস ইত্যাদির সাথে ভৌতভাবে সংযোগের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যে কোনো তথ্য বা উপাত্ত আদান প্রদান করা সম্ভব। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সমষ্টি এবং সকলে মিলে একটি একক নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েব সাইট ব্রাউজিং, ই-মেইল পাঠানো বা গ্রহণ, ভিডিও কনফারেন্স, চ্যাটিং, পরস্পরের সাথে তথ্য বা উপাত্ত আদান প্রদান ইত্যাদি করা যায়। এছাড়াও ট্রেন, বাস বা প্লেনের টিকিট বুকিং দেয়া যায়। ই-ব্যাংকিং ও শপিং করা যায়। যে কোনো সময় অন-লাইনে লাইব্রেরীর লক্ষ লক্ষ বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদির সন্ধান করা যায়, প্রায়োজনে তা পড়া যায় এমনকি সেগুলোকে ডাউনলোড করে নিজের কম্পিউটারে রাখা যায় বা ছেপে বের করে নেয়া যায়। এছাড়াও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে টেলিফোন, মাইক্রোওয়েভ, কৃত্রিম উপগ্রহ, অপটিক্যল ফাইবার এর ব্যাকবোনের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে তথ্য বা চিত্র পাঠানো যায়। আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্যাক্স, মেইল ও ভয়েস মেইল ভিডিও চিত্রের

মাধ্যমে সরাসরি কথা বলা এবং আদান প্রদান করা যায়। অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান খরচ অত্যন্ত কম।

১৪.৫.২.২ ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল বা ইলেকট্রনিক মেইল আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করে যে কোনো ডকুমেন্ট, চিঠি-পত্র, চিত্র বা গ্রাফিক্স এবং যে কোনো তথ্য আদান প্রদান করা যায়। টেলিফোন লাইন ও মোডেম ব্যবহার করে এ সংযোগ স্থাপন করা যায়। প্রেরণকৃত তথ্য প্রাপক গ্রহণ না করা পর্যন্ত নেটওয়ার্কের একটি স্টোরেজে (সার্ভার) জমা থাকে।

ই-মেইল কীভাবে প্রেরক থেকে প্রাপকের কাছে যায় তার একটি ব্লক চিত্র দেয়া হলো।

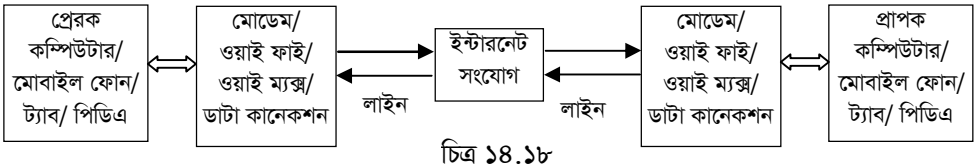

চিত্র ১৪.১৮

ই-মেইল শব্দটির সাথে সকলের পরিচয় থাকলেও এই পদ্ধতিটি আমাদের হাতে কলমে শেখা দরকার। ওয়েব সাইট গুলিকে জনপ্রিয় করার জন্য, সারাবিশ্বে ব্যবহারকারি বাড়াবার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ফ্রি ই-মেইল সার্ভিস চালু রেখেছে। এই সকল ওয়েব সাইট কোনরকম চার্জ ছাড়াই ই-মেইল একাউন্ট খুলতে দেয়। ফ্রি একাউন্ট খুলতে চাইলে প্রথমে যে কোনো অর্থাৎ যারা ফ্রি একাউন্ট খুলতে দেয় তাদের সাইটে ঢুকতে হবে, এবং লক্ষ্য করতে হবে মেইল কোথায় লেখা আছে। এবার মেইল এর উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করলে একটি বক্স আসবে এর মাঝে যাদের পূর্বের একাউন্ট আছে তাদের জন্য সাইনইন এবং যারা নতুন একাউন্ট খুলতে চায় তাদের জন্য সাইনআপ বা ক্রিয়েট মাই নিউ একাউন্টে ক্লিক করতে হবে এর পর একটি ফরম আসবে সেখানে নিজের নাম ঠিকানা এবং ই-মেইল কি নামে হবে তা নির্ধারণ এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তি অপশনে যেতে হবে। একাউন্টটি হয়ে গেলে পরবর্তিতে ঐ একাউন্ট এর মাধ্যমে যাবতীয় ডকুমেন্ট আদান প্রদান করতে পারবেন, এখানে উল্লেখ থাকে যে, যে কোম্পানীর ওয়েব সাইট ব্যবহার করা হবে তার নাম একাউন্টকারীর নামের পরে লেখা থাকবে, যেমন ব্যবহারকারির নাম @Yahoo.com , নাম @gmail.com, নাম @ msn.com, নাম @rediffmail.com, নাম @usa.com ইত্যাদি। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড থাকবে। ওয়েব পেজের শেষের অংশ দেখলেই বুঝা যাবে সাইটটি কি ধরনের। যদি সাইটের নামের শেষে .com থাকে তবে কমার্শিয়াল, .org থাকে তবে প্রতিষ্ঠানের .net থাকে তবে নেটওয়ার্ক কোম্পানির, যদি .edu থাকে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ই-মেইল একাইন্টের উদাহরণঃ rana@yahoo.com, অথবা babu1234@gmail.com

১৪.৫.৩ জীবনযাত্রার উপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত ডিভাইসসমূহের প্রভাব ঃ

বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়েছে যোগাযোগ। প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি ডাটা আদান প্রদানের মাধ্যমে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে বিপ্লব এসেছে তার ছোয়া থেকে কোনদিক বঞ্চিত হচ্ছে না। যেমন প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বিনোদনের মাধ্যম, চিকিৎসার সুবিধা, ই-গর্ভনেন্স, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে, ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে, গবেষণার জন্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে, এমন কোনো জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে না। এক কথায় বলতে গেলে তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়েছে।

এই তথ্য প্রযুক্তির কিছু কুপ্রভাবও আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। তবে সুকৌশলে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, তথ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ, বেকারত্ব সৃষ্টি, মিথ্যা প্রচারণা, ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। একশ্রেণীর মানুষ তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, অন্যদিকে অজ্ঞতার কারণে আরেক শ্রেণীর মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে আধুনিকতার জ্ঞান ও সুযোগ সুবিধা থেকে। এছাড়াও মানুষ অতিরিক্ত

যন্ত্র নির্ভর এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে স্বাভাবিক জীবনের অনিয়ম ঘটার ফলে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

সার-সংক্ষেপঃ

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (CPU) ঃ সিপিইউ কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কম্পিউটারের মস্তিষ্কের মত। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, গাণিতিক ইউনিট ও স্মৃতি ইউনিট এই তিনটি অংশকে একত্রে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বলা হয়।

ইন্টারনেট ঃ ইন্টারনেট হলো একধরণের নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যার সাহায্যে বিশ্বের সকল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। অসংখ্য কম্পউটারে, মোডেম, টেলিফোন লাইন, ওয়ারলেস ইত্যাদির সাথে ভৌতভাবে সংযোগের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যে কোনো তথ্য বা উপাত্ত আদান প্রদান করা সম্ভব। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সমষ্টি এবং সকলে মিলে একটি একক নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে।

ই-মেইল ঃ ই-মেইল বা ইলেকট্রনিক মেইল আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করে যে কোনো ডকুমেন্ট, চিঠি-পত্র, চিত্র বা গ্রাফিক্স এবং যে কোনো তথ্য আদান প্রদান করা যায়। টেলিফোন লাইন ও মোডেম ব্যবহার করে এ সংযোগ স্থাপন করা যায়। প্রেরণকৃত তথ্য প্রাপক গ্রহণ না করা পর্যন্ত নেটওয়ার্কের একটি স্টোরেজে (সার্ভার) জমা থাকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্নঃ

১.এক্সরে হলো এক প্রকার-

i. ইলেকট্রন প্রবাহ বিশিষ্ট তরঙ্গ

ii. আলোর ন্যায় তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ

iii. 10^{-8}m থেকে 10^{-13}m -এর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

নীচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

● নীচের অংশটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কোনো বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীকে অশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীতে রূপান্তর করতে তিন যোজী বা পাঁচ যোজী পরমাণু দ্বারা ডোপিং করা হয়।

২. ডোপিং করার ফলে

i. অর্ধ পরিবাহীটির পরিবাহীতা বৃদ্ধি পায়

ii. অর্ধ পরিবাহীটিতে হোল বা ইলেকট্রনের আধিক্য বৃদ্ধি পায়

iii. অর্ধ পরিবাহীটি আধান নিরপেক্ষ থাকে

নীচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. কয়টি তিন যোজী ও পাঁচ যোজী পরমাণু দ্বারা ডোপিং করা অশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী দিয়ে একটি p-n-p ট্রানজিস্টার তৈরি করা যায়?

ক. তিন যোজী দুটি ও পাঁচ যোজী একটি

খ. তিন যোজী একটি ও পাঁচ যোজী দুটি

গ. তিন যোজী তিনটি ও পাঁচ যোজী একটি

ঘ. তিন যোজী একটি ও পাঁচ যোজী তিনটি

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. পার্শ্বে একটি বর্তনী দেয়া হয়েছে। বর্তনীটি লক্ষ্য কর এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

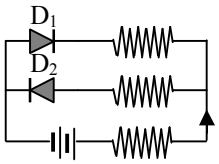

ক. ডায়োড কি?

খ. চিত্রে কোন ডায়োডে সম্মুখ ঝোঁক দেয়া হয়েছে ব্যাখ্যা করুন ।

গ. ব্যাটারীর সংযোগটি বিপরীত মুখী করে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের কোনো পরিবর্তন হতো কিনা আলোচনা করুন ।

ঘ. কি কি করলে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে? তোমার উত্তর বিশ্লেষণ করুন ।

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.১	১। (খ)	২। (ক)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.২	১। (ঘ)	২। (ঘ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.৩	১। (খ)	২। (খ)	৩। (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৪.৪	১। (ক)	২। (ক)	৩। (ঘ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ১৪

১। (গ) ২। (ঘ) ৩। (ক)